ব্যথিতার গান

(সচিত্র)

স্বর্গীয়া চারুলতা দেবী ভারতীর
কবিতাবলী ৷

"এষার কবি" ও "রবীন্দ্রনাথ"-প্রণেতা
শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম্-এ, বি-এল্-লিখিত
কবির জীবনী-সম্বলিত।

জীবনে অনেক সাধ
গিয়াছে বিফল হ'য়ে,
অযুত বাসনা, আশা
তৃষ্ণা এনেছে বয়ে ;
তাহাঁদের অভিঘাতে
ব্যথিত আকুল প্রাণ,—
লেখিনীর মুখে তাই
অশ্রু করেছি দান।

চারুলতা

——:০:——

[কবির জীবনী—পৃষ্ঠা (ক)–(ন)]

বিষয়		পৃষ্ঠা

-:0:-

স্বর্গীয়া চারুলতা দেবীর জীবনী।

স্বর্গীয়া মহিলা-কবি চারুলতা দেবীর জীবদ্দশায় তাঁহার রচিত বিস্তর উৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গভাষার মাসিক-পত্রিকার পাঠকগণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার অবসর পাইতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কবির জীবন-চরিত তাঁহার রচিত কাব্যেই পাঠ করিবার সুবিধা হয়। তাহা হইলেও, কবির কাব্য হইতে কবি অনেক বড়, আর সেইজন্য কবিবিশেষের সুসম্পূর্ণ জীবনেতিহাস যতদিন না পাঠ করা যায় তাঁহার রচিত কাব্য ততদিন কবিকে বুঝিবার পক্ষে খুব বেশী সাহায্য করে বলিয়া মনে হয় না। কবিতার ভিতর দিয়া কবিকে যতটা বুঝা যায় তাহার তুলনায় কবির দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী তাঁহাকে বুঝিবার পক্ষে অনেক বেশী সুবিধা প্রদান করে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-জগতে সেইজন্য গেটে-সমিতি, ব্রাউনিং-সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যাহার মারফৎ মৃত কবিবিশেষের সম্বন্ধে নানাবিধ উপাদেয় তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। এদেশে পুরুষ-কবিদের জীবনী-সংগ্রহের জন্য তবু দুই একটা সাময়িক অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু মহিলা-কবিরা আজ পর্য্যন্ত উপেক্ষিতা হইয়া আছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান নারী জাগণের দিনে চারুলতা দেবীর মত একজন উৎকৃষ্ট কবিতা-রচয়িত্রীর জীবনের দুই-চারিটা কথা সেইজন্য এই কবিতা-পুস্তকের সূচনায় আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবির স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর লিখিত পত্রে কবির জীবনী সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে চারুলতা দেবীর বংশের ও রোমান্টিক্ ঘটনাপূর্ণ গার্হস্থ্য-জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শান্তিলতা দেবীর পত্র—

"সবিনয় নিবেদন—

মাসিক পত্রিকার লেখক ব্যতীত আপনার অন্য কোনও পরিচয় আমি জানি না, কিন্তু আমার স্বর্গীয়া দিদির মুখে আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনি আমাদের সহোদর ভ্রাতার অপেক্ষাও অনেক বেশী। সেই অধিকারের দাবী জানাইয়া বলিতেছি যে, আমার দিদি আপনার লেখা ও সমালোচনার অত্যন্ত

পক্ষপাতিনী ছিলেন। * * বিখ্যাত কমলাকর মিশ্রের বংশে চারুলতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ-ডি, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ," "রামানুজচরিত" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সংস্কৃত কলেজের হেড্ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ইঁহারা চারুলতার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। আবগারী ইন্সপেক্টর শ্রীযুত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য মহাশয় ইঁহার পিতা। প্রফেসর ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী পি-আর-এস্, প্রফেসর হেমচন্দ্র আচার্য্য এম্-এ, ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি কৃতবিদ্য মহাশয়গণ ইঁহার ভ্রাতা।

"চারুলতা তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ইঁহার মাতুল ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ভগবানে চারুলতার নির্ভরশীলতা দেখিয়া ও ইঁহার রচিত কবিতা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিকল্প এই বৃদ্ধ ডাক্তার চারুলতাকে এত স্নেহ করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তিনি এমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহাকে কেহ সেরূপ শোকার্ত্ত হইতে দেখে নাই।

"কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সুযোগ্য ইণ্টারপ্রেটার শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল, এম্-এর সহিত চারুলতা দেবীর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ইতিপূর্ব্বে ঘোষাল মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী সংসার ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা চারুলতা সেই সংসারে সেতু বাঁধিলেন।

"বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালের ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে কলিকাতা নগরীতে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে চারুলতা জন্মগ্রহণ করেন। চারুলতা জন্মগ্রহণ করিবার পরে তাঁহার পিতার সরকারী কার্য্যে পদোন্নতি হয়

"সাহিত্য-সাধনা ছিল চারুলতা দেবীর জীবনের মূলমন্ত্র। এই রবীন্দ্র-যুগে তাঁহার কবিতায় কোনও কবির রচনা-শিল্পের ছায়া পতিত হয় নাই। তাঁহার পদ্যময় রচনায় এমন একটি নিজস্ব সুর আছে যাহা সহজেই চিত্তাকর্ষণ করে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাহায্যে তিনি চিন্তা-রাজ্যে সকল বিষয়ের সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। চারুলতা দেবীর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। প্রতিদিন তিনি ৬।৭ খানি পুস্তক পাঠ করিতেন ও প্রত্যেক পুস্তকের ভাব, ভাষা, উদ্দেশ্য, সঙ্গতি প্রভৃতি বিচার করিতেন। তিনি নূন্যাধিক দশহাজার পুস্তক পাঠ

করিয়াছিলেন। তাঁহার মেধা-শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী পুস্তকের পঠিত বিষয় তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল।

"বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। তিনি অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় বা কার্য্যে তাহার আভাসমাত্র প্রকাশ পাইত না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, কোনও প্রার্থীই তাঁহার নিকট হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। দান করিয়া তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সবিনয়ে নিষেধ করিতেন।

"ছোট-বড়, আপন-পর সকলকেই তিনি এমনই স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ যিনি শুনিতেছেন তিনিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

"চারুলতা দেবীর দেহ ও মনের আবরণ ছিল তাঁহার সংযম-শক্তি; কথায় ব্যবহারে কার্য্যে কোথাও এতটুকু অসংযম প্রকাশ পাইত না। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বৎসর তখন তাঁহার হাঁপানি রোগ হয়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তিনি এই কাল-ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না, তখন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে স্বামীর আবার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের ইতিহাস যথার্থই চিন্তাতীত ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া সংসারটীকে বজায় রাখিবার জন্য ও একাধিক শিশু কন্যাপুত্রের লালন-পালনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিবাহ সম্পাদিত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী সপত্নীর পিত্রালয়ে গিয়া চারুলতা স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। তখন চারুলতার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। তাঁহার পিতা ও পরিজনবর্গ এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন বলিয়া বিবাহ-কার্য্য গোপনে সম্পন্ন হয়।

"চারুলতার স্বামীর কর্ত্তব্য-পরায়ণতাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের তুলনা হয় না। চিররুগ্না স্ত্রীর পরামর্শানুসারে পুনরায় বিবাহ করা ও তাঁহার নির্দ্দেশমত তৃতীয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা বড় অল্প শক্তির কাজ নহে। দ্বিতীয়ার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াও তিনি তৃতীয়ার প্রতি অবিচার করেন নাই।

"চারুলতা দেবীর একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা-সন্তান হইয়াছিল। পুত্রটী ও প্রথমা কন্যাটী অতি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বেদনা পান্। কনিষ্ঠা কন্যা শেফালী তাঁহার শোক-সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা দেয়

"চারুলতা দেবী গয়া, কাশী, দেওঘর, পুরী, রাঁচী, খড়্গাপুর, মেদিনীপুর, প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়টী দিন তিনি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজগিরে অবস্থানকালে দেহত্যাগ করেন। তিনি শান্তি-প্রার্থিনী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত শান্তি-নিকেতন অহিংসধর্ম্মের দেশে ২৯ বৎসর বয়সে বিগত ১৬ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সালে বিজয়াদশমীর পরদিবস পুণ্যতিথি একাদশীতে অপরাহ্নে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার সপত্নী-পুত্রকন্যাগণ তাঁহার মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত, তাহারা অনাথের ন্যায় কাঁদিতেছে। তাঁহার স্বামীর জীবন শ্মশান-সদৃশ হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাকে শান্তি দিন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

চারুলতা দেবীর সাহিত্য-চর্চ্চা যে বংশগত সংস্কারের ফল তাহা মানিয়া লইলেও তাঁহার কবি-জীবন যে ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, ইহা নেহাত অনুমান-সাপেক্ষ নহে। চারুলতা ও তাঁহার ভগিনী শান্তিলতা অবকাশ পাইলে কিরূপে রচনা-শিল্পের অনুশীলন করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "ভিক্ষা" শীর্ষক একটি অল্পায়তন কবিতার ইতিহাস হইতে। অভিন্ন-হৃদয় এই দুই ভগিনী স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কবিতা রচনা করেন। আলোচ্য কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়টী ঠিক করিয়া লইয়া তাঁহারা যেন পরীক্ষা-মন্দিরে বসিয়া কবিতাটী রচনা-করিয়াছিলেন।

ভিক্ষা।

(শান্তিলতা দেবী-রচিত)

দারুণ উদ্বেগ বহিয়া হৃদয়ে
চিত্ত করিয়া শান্ত,
যে মন্ত্রের বলে সাবিত্রী একদা
শমনে করিলা ভ্রান্ত,
তোমার চরণে নতশিরে আজ
মাগি আমি এই ভিক্ষা,
সে অজেয় মন্ত্রে ওহে জগদীশ,
দাও আমাদের দীক্ষা।

যে শক্তির বলে চিরদিন সীতা
বিপদে ধরিলা ধৈর্য্য,
জ্বলন্ত অনল, মিথ্যা অপবাদ
নীরবে করিলা সহ্য,
গভীর অরণ্যে নির্ব্বাসিতা, তবু
অচঞ্চলা পতিভক্তি,
ওহে জগদীশ, এ দুর্ব্বল চিতে
দাও পুনঃ সেই শক্তি।

শত শত শত চিতোর-ললনা
চমকিত করি বিশ্ব,
যে শক্তির বলে প্রবেশি অনলে
দেখাল অপূর্ব্ব দৃশ্য,
ওহে জগদীশ, দাও সেই শক্তি
তব কাছে চাহি ভিক্ষা,
তাঁদের সমান হ'তে পারি যা'তে
দাও পুন সেই শিক্ষা।

শক্তির বলে ভারত ললনা
জগতের মাঝে পূজ্য,
আজিও অস্ত যায় নি যাদের
গৌরব-গরিমা-সূর্য্য ;
আমরাও সেই তাঁদেরই দুহিতা,
শক্তি যে আজ সুপ্ত,
পুন সেই শক্তি সঞ্চার করিয়া
জড়তা কর হে মুক্ত।

ভিক্ষা।

(চারুলতা দেবী-রচিত)

চিন্তার আঘাতে চূর্ণ
সুকোমল সুচারু অন্তর,
তবু মুখে হাসি আছে,
কণ্ঠে আছে স্নেহমাখা স্বর।
নিমেষ-নিহত আঁখি
পতি-মুখপানে রাখি
সাবিত্রী ফিরাল' যমে
প্রকাশিয়া যে শক্তি তাহার,
জগদীশ, সেই শক্তি
দাও আজি হৃদয়ে আমার

যে শক্তি ধরিয়া বক্ষে
বিশ্বলক্ষ্মী জনক-দুহিতা,
জগতে অপরাজিতা,
মানবের সমাজে পূজিতা।
নতশিরে যুক্ত-করে
পতির আদেশ ধ'রে,
অপবাদে অগ্নিভয়ে
নির্ব্বাসনে নহে বিচলিত,
এ দুর্ব্বল বক্ষে দেব,
সেই শক্তি কর সঞ্চারিত।

বিস্মিত পাঠান-রাজ,
মেবারের রাজ-অবরোধে
অনল উঠিল জ্বলি উপেক্ষিয়া
সম্রাটের ক্রোধে।

শত রাজপুত নারী
যে শক্তি হৃদয়ে ধরি,
আদরে জহর-ব্রত
উদ্‌যাপিল অনলে পশিয়া,
জগদীশ, সেই শক্তি
এ হৃদয়ে দেহ সঞ্চারিয়া।

যে শক্তি থাকিলে বুকে
সগৌরবে আনন্দিত স্বরে
দিতে পারি পরিচয়
বঙ্গনারী বলি আপনারে।
নারীর উচিত কাজ
সাধিতে পারিব আজ
যে শক্তির দৃঢ়বলে—
উপেক্ষিয়া ধরার আঘাত,
সে শক্তি তোমার কাছে
যাচি আজি জগতের নাথ।

[১৩১০, ১০ই কার্ত্তিক রচিত—১৩৩১ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

চিত্রকরের চিত্রশালায় কত অসমাপ্ত সখের-চিত্র, কত নক্সা, কত প্রাচীন আদর্শ-চিত্র, কত সৌখী ছবি সঞ্চিত থাকে। যথার্থ শিল্পীর তুলিকা বা লেখনী অলসতা জানে না। চারুলতা দেবীর রচিত বহু অপ্রকাশিত কবিতা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন রচনা-শিল্পের সাধনাদ্বারা তাঁহার কবি-জীবনে এমন বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন যাহা শুধু বংশগত প্রতিভার সাহায্যে লাভ করা সম্ভবপর নহে। চারুলতার বংশগত সংস্কার তাঁহাকে জ্ঞানার্জ্জনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। প্রতিভা তাঁহাকে সেই পথ দিয়াই কাব্য-মন্দিরে লইয়া আসে। চারুলতা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বংশের পুরুষগণ গদ্যময় রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। চারুলতার কবি-জীবনে

গন্থ পন্থময় হইয়া লেখনী-মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা সেইজন্য কবিতা-রচনা ক্ষেত্রে চারুলতার এতখানি উৎসাহ লক্ষ্য করি। পুরাতনের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার প্রতিভার নব-জাগরণের প্রমাণ পাই আমরা তাঁহার রচিত "উদ্বোধন" নামে কবিতায়।

চারুলতা দেবীর অন্তর্জগতে যে সাড়া পড়িয়াছে, এই কবিতা পাঠে তাহা বুঝা যায়। পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রভাব কোনও কবি উপেক্ষা করিতে পারেন না, চারুলতা দেবীও পারেন নাই। আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, উক্ত কবিতা যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে এই মহিলা-কবির হৃদয় প্রসারিত হইতেছে, নূতন জ্ঞানের রশ্মিরেখা ভিতরে দেখা দিয়াছে, সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা কবির হৃদয়-রাজ্যের অধিকার হইতে লোপ পাইতেছে। এখনো কিন্তু বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাল দিক্‌টা যে কবির চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। উৎসাহ উদ্যম আশা কিশোরীর কবি-হৃদয়ে রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নালোক ঢালিয়া দিয়াছে। আলোর পিছনে যে একটা আঁধারের ছায়া থাকিতে পারে, সে কথা কিন্তু কবির মনে তখনো স্থান পায় নাই। চারুলতা দেবীর স্বহস্তে লিখিত খাতাগুলির মধ্যে যে খাতায় "উদ্বোধন" নামে কবিতাটী আছে সেই খাতায় কয়েকটী গন্থময় রচনাও স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত। এই প্রবন্ধগুলিতে লেখিকার গন্থরচনার নমুনা যেমন পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে সমালোচনা-ক্ষেত্রে তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ-পদ্ধতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"নারী জাগরণের পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধে সংস্কারের নামে পুরুষের কপটতার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ-লেখিকার তীব্র মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে, তিনি আজকাল্‌কার নারী-প্রগতির ফ্যাসানের বশবর্ত্তী হইয়া সাফ্রেজিষ্ট সাজিয়াছেন, নারীর গুণ ছাড়া দোষ কিছুই নাই আর পুরুষের দোষ ছাড়া গুণ কিছুই নাই—ইহাই তাঁহার অভিমত। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা" ও "সভ্য সমাজে নব্য রোগের ভব্য চিকিৎসা" প্রভৃতি রচনা গুলি প্রাচ্য আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ।

এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, চারুলতা দেবী অভিজ্ঞতার পাঠশালায় বাঙ্গালী জাতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার ফল লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তাধারায়

যে মৌলিক গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে, বিচার শক্তি যে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এই শ্রেণীর গদ্যময় রচনায় পাই। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুরুষের দায়িত্ব কতটা তৎসম্বন্ধে চারুলতার অভিমত সমাজ-সংস্কারকগণের হয়ত ভাল লাগিবে না, কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক নিশ্চয় চারুলতা দেবীকে সমর্থন করিবেন। এদেশে নারীগণের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পুরুষেরা যে নারী জাতির উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে ইহা সকলেই জানেন। নারী-চরিত্র গঠনের জন্য পুরুষেরা যে দায়ী এই সিদ্ধান্তে চারুলতা দেবী পুরুষ ও স্ত্রীর কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিয়া উপনীত হইয়াছেন।

সমাজ-ব্যাধি সম্বন্ধে যিনি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন তাঁহার বহুদর্শন যে মূল্যবান উপদেশ দিবার মত অবস্থায় আসিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চারুলতার বহির্দৃষ্টি সমাজ-দেহের দুষ্ট ক্ষতচিহ্নগুলির দিকে আকৃষ্ট হইলেও তাঁহার প্রতিভাকে ব্রণ-মক্ষিকার ন্যায় ঘৃণিত কার্য্যে, লিপ্ত করিতে সাহসী হয় নাই। নব্য-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজের রঙ্গমঞ্চে পাপের, ব্যভিচারের, বিলাসিতার ও কপটতার চিত্র দেখিয়া চারুলতা অশ্রুসিক্ত নয়নে শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আর্টের নামে কুরুচির নগ্ন-চিত্রকে সাহিত্যের বাজারে ফেরী করিয়া প্রশংসা লাভের চেষ্টা কখনো করেন নাই। ইহার কারণ, চারুলতার অন্তর্দৃষ্টি প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতিভাকে আত্মানুসন্ধানের পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, চারুলতা দেবীর অন্তর্জগতে কিরূপে আত্মানুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সত্যের আলোক পাইবার আশায় তিনি যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা পাই তাঁহার স্বহস্তে লিখিত বিস্তর পত্র হইতে। চারুলতার স্বামী কলিকাতা পুলিশ কোর্টে দ্বিভাষীর কার্য্য করাতে মিঃ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল, এড্‌ভোকেট ও মিঃ শিবচন্দ্র ঘোষ বি-এল,-প্রমুখ চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণের সহিত চারুলতার পরিচয় হইবার সুবিধা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ছাত্রীর মত মিঃ গুপ্তকে পত্র লিখিতে চারুলতা দ্বিধা বোধ করেন নাই। জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা চারুলতার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

মিঃ কেশবচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত উত্তর।

কল্যাণীয়া—

আত্মহত্যা মহাপাপ। অপঘাত-মৃত্যু মহাপাপ নয়। কিন্তু উভয়ের ফল এক অর্থাৎ অগতিঃ। মোটামুটি এই আপনার প্রশ্ন।

প্রথমতঃ পাপ পুণ্যের বর্ণনা নির্দ্দেশ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে গেলে একটা দর্শনের মতানুসারে নিজের জীবনকে চালাতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বা নীতিতত্ত্বের মতে পাপ ও পুণ্য বিভিন্ন প্রকার। ধরুন, বৈষ্ণবতত্ত্ব। যে কার্য্য আমাদের অন্তে মোক্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিবার অনন্ত অধিকার লাভ করিবার অন্তরায় হয় তাহা পাপ। যে কার্য্য অকৈতব ভক্তি বাড়ায় তাহা পুণ্য কর্ম্ম। অদ্বৈতবাদ বলে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক যাতে হয় সেই পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবের। সুতরাং সেই অন্তিম লক্ষ্যস্থানে যে কার্য্য লইয়া যায় তাহা পুণ্যময়, যা' নিয়ে যায় না সে-ই পাপ কর্ম্ম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, কোন জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম বা আবর্ত্তনের দ্বারা ধীরে ধীরে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তবে সে চরম মোক্ষ বা নির্ব্বাণ বা সাংখ্য-মতে আত্মদর্শন উপলব্ধি করিতে পারে।

এখন আপনার প্রশ্নের কথা। আত্মঘাতী পৃথিবীর জ্বালা সহ্য করতে পারে না, তাই নিজের কর্ম্মের দ্বারা এ দেহকে ত্যাগ করে। এই যে পৃথিবীর জ্বালা—এ নিজকৃত কর্ম্মফল। তার ফল ভোগ করিতেই হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা সেই বাকী ভোগগুলা কাটল না—সেগুলা জমা রহিল। তাহার উপরে দেহকে নষ্ট করার পাপ জমা হইল। এই স্থূল-জগতে কার্য্যের দ্বারা তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইহা আমাদের আবর্ত্তন বা মোক্ষের ধারা। তাই নিজের বা পরের দেহের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদ ঘটাইলে পাপ করা হয়, কারণ যে উপায়ে আমরা মোক্ষ লাভ করিব সে উপায়কে পিছাইয়া দিয়া (পূর্ব্বের বর্ণনা মতে) আমরা পাপ করি। ইহা দ্বিগুণ পাপ—হত্যার এবং কর্ম্ম না ক্ষয় করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখার। কাজেই ইহার ফল অগতিঃ। গতি তাহা যাহার দ্বারা মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। অগতি—যাহা আমাদেরকে পিছাইয়া দেয়।

অপঘাতীরও অগ্রসর হওয়া হয় না। কারণ ভোগক্ষয়ের পূর্ব্বে দেহের বিনাশ হয়—সঞ্চিত কর্ম্মফল বস্তাবন্দি থাকে। নিজের দেহকে যদি উত্তমরূপে

যত্ন করে তো লোকে অপঘাতে মরে না। ভালুক-নাচ দেখার তুচ্ছ প্রলোভনে মানুষ যদি ভাঙ্গা ছাদের উপর দাঁড়ায়—পরীক্ষা না করিয়া—তাহা হইলে সেই অসাবধানতার জন্য তাহার একটু পাপ হয়। তাহার অগ্রসর হওয়া বন্ধ হয়, তাই তাহার অগতি হয়।

বলা বাহুল্য, এই পাপ পুণ্য বা গতি অগতির মাত্রা সকলের পক্ষে এক নয়। আমি জানি সুরাপানে যকৃত রুগ্ন হয়, জ্ঞান লোপ পায়, লোকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়। বেচারা মূর্খ সাঁওতাল হয় তো তাহা জানে না। সুরাপানে আমি যতটা পাপ করিব সে ততটা করিবে না। তাহার পক্ষে হয়ত সুরাপান আবশ্যক, এমন কি পুণ্য। যখন সুরাপান করিলে তাহার লিভারে ব্যথা হইবে, প্রতিবাসীকে গালাগালি দিয়া প্রহার খাইবে, তখন তাহার জ্ঞানলাভ হইবে যে সুরাপান মন্দ।

অবশ্য আমি যাহা লিখিলাম তাহা হিন্দু এবং পরকালে বিশ্বাসী লোকের জন্য।

অনেক গুরু বিষয় মাত্র ইঙ্গিতে বুঝাইলাম, কারণ আমার বিশ্বাস আপনি এসব কথা জানেন। প্রকৃত পক্ষে এই সব কথা বিশদ করিয়া লিখিলে একখানি পুস্তক লেখা যায়।

আমি ইতিপূর্ব্বে পত্রের জবাব দিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। নমস্কার। ইতি

শুভাকাঙ্খী—
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

চারুলতা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবদ্গীতা সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, রঘুবংশের প্রথম কয়েক সর্গ ও ত্রয়োদশ সর্গ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে সম্যক বুৎপত্তি না থাকিলেও কর্ম্মবাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। ভগবদ্গীতার জ্ঞানবাদ অপেক্ষা কর্ম্মবাদকেই তিনি প্রথম স্থান দিতেন। মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে পিতার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে, শত কোটী কল্পেও যে জীবের কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, ভগবান শঙ্করের এই উক্তি সমর্থন করিয়া তিনি বলেন, সারাজীবন এত মানসিক ও শারীরিক নানাবিধ যন্ত্রনা যে তিনি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহা কত জন্মের কর্ম্মফল তাহা কে বলিতে পারে? চারুলতার সত্ত্বগুণ-প্রধান নির্ম্মল স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, ইহা তাঁহার বহুজন্মের পুরুষকার লব্ধ ফল। পুরুষকার

দ্বারা স্বভাবকে যেমন নির্ম্মল করা যায়, কর্ম্মফলকেও যদি সেইরূপ ক্ষয় করা যাইত, তাহা হইলে চারুলতার মতে তাঁহাকে জীবনে এত অসুখী হইতে হইত না।

নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা চারুলতার অন্তরে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া বসিয়াছিল। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উড়িয়া ও ইংরেজ ভাষায় তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ কর্ত্তৃক "ভারতী" উপাধি-ভূষণে ভূষিতা হইয়াছিলেন। "কলিকাতা গেজেটে" যথা সময়ে উপাধির তালিকায় তাঁহার এই উপাধি লাভের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন তিনি হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। চারুলতা স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ না করিয়াও যে একাধিক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা বটে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা শক্তিশালী মস্তিষ্কের সাহায্যে অনায়াসে ভাষার পর ভাষা আয়ত্ব করিবার পক্ষে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল, একথা যখন আমরা স্মরণ করি তখন আর বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকে না। যথার্থ প্রতিভাকে হিন্দুর অবরোধ-প্রথা কখনো রুদ্ধ রাখিতে পারে না। ঘরের বারাণ্ডায়, ছাদের উপরে, মাটির টবে গোলাপ ফুল কি তাহার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে না? একটু আলো, একটু বাতাস, খানিকটা জল পাইলে নার্সারির কাচের গৃহেও রহস্যময়ী প্রকৃতিদেবী কণ্টকিত পুষ্পবৃক্ষের শাখায় তাঁহার সৌন্দর্য্য-লীলার অভিব্যক্তি দেখাইতে পারেন। চারুলতা তাঁহার উচ্চ-শিক্ষিত আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেকটা বেশী আলো পাইয়াছিলেন। স্বামীর উদারতা তাঁহাকে মনোময় রাজ্যে স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিবার সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। চারুলতার সংসারে সহানুভূতির তরল সিঞ্চনেরও অভাব ছিল না। প্রকৃতিগত সংস্কারের বীজ সেইজন্য অঙ্কুরিত হইবার পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই বিদুষী মহিলা অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারিণী হইয়াও কোনও প্রকার প্রশংসা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ১৩৩৫ সালের ২০ শে আশ্বিন তারিখে লিখিত একখানি পত্রে তিনি প্রশংসার বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"আপনি আমাকে দেখিতেছি প্রশংসার বেলুনে তুলিয়া দিয়া দূর হইতে

আমার উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করিতেছেন। যে বেচারা অত উচুতে উঠিয়াছে তার প্রাণ পড়িয়া যাইবার ভয়ে যে জাগিয়া রহিয়াছে সেটা আপনি বোধ হয় ভাবিতেছেন না। দূরে থেকে পাহাড়গুলিকে বেশ সুন্দর দেখায়। মেঘের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া কবিরা কতশত যুগ কাটাইয়া দিয়াছে, তবু তাহারা মেঘের সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কল্পনা আমাদের চোখে এমন এক খানা রঙিন্ চশমা আঁটিয়া দেয় যে, তাহার ভিতর দিয়া দূরের জিনিষ অসুন্দর দেখায় না। ওসব আপনি জানেন, তবু যে আমাকে প্রশংসার উড়ো জাহাজে তুলিয়া দিয়া দূরবীণের ভিতর দিয়া আমার গতি লক্ষ্য করিতেছেন, ইহাতে যদি আপনার অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা হয় তাহা হইলে ভাল, কিন্তু ভুলক্রমে কল্পনার বশীভূত হইবেন না।"

চারুলতা বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বিনয়গুণের পূর্ণমাত্রায় অধিকারিণী হইয়াছিলেন। সেইজন্য কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিলে তিনি যেন জড়সড় হইয়া পড়িতেন। অবরোধের মধ্যে তিনি বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমেই তিনি আজীবন বিদ্যানুশীলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনে প্রশংসানুভূতির বিকাশ দেখা যায় না। চারুলতার মনস্তত্ত্বের বিচার করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার অন্তর্জগতে কোনও স্থূল হৃদয়-ভাব জাঁকিয়া বসিবার অবসর পাইত না। প্রশংসা সেইজন্য তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পাদন করিয়া আত্মোন্নতির অন্তরায় হইতে পারে নাই। লজ্জাবতী লতার মত চারুলতা প্রশংসার মৃদু স্পর্শনেও সঙ্কুচিত হইতেন। চারুলতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ছিল তাঁহার বিনয়গুণ। একটিমাত্র ছত্রে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের ভাষায় বলিতে হয—

"লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ"—

(গোবিন্দদাসের করচা)

চারুলতাকে কেহ কবি বলিলে যেন তাঁহার অসহ্য কষ্ট হইত। তাঁহার লিখিত উপরোক্ত পত্রের শেষভাগে তিনি যেভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে প্রশংসা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"আপনি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই আমাকে "কবি" বলিয়া থাকেন, ঐ কথাটা পড়িলেই সতর বৎসর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িয়া যায়। বাবা তখন খড়গপুরে বদলী হইয়াছিলেন, হেড্-কোয়ার্টার্স ছিল মেদিনীপুর। আমরা

মেদিনীপুরেই ছিলাম। নূতন বাসায় আসিয়া দেখিলাম, একটা বিড়াল যখন-তখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসে। আমি একটা কাগজে চার লাইন কবিতা লিখিয়া বিড়ালের গলায় বাঁধিয়া কপালে একটা সিন্দুরের দীর্ঘ ফোঁটা টানিয়া দিলাম। কাগজে লেখা ছিল—

"ভাজা মাছ খেয়েছি বলে আমার এত মান,
গলে জয়-পত্র আর কপালে তিলক দান।
ভাবছি এবার কড়া থেকে দুধটুকু খেয়ে,
পথে পথে বেড়াইব হরিনাম গেয়ে।"

সকালবেলা এই কীর্ত্তি করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন ভদ্র-মহিলা আমাদের বাসায় আসিলেন। মা বিস্মিত হইয়া অপরিচিতাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একজন হাসিয়া বলিলেন, "বিড়ালের গলায় কবিতাটি কে লিখেছে ? এ পাড়ার সকলকার হাতের লেখাই আমরা চিনি।" মা আমার নাম করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মেয়েটি আপনার কবি।" আমি ত কবি, কবিতায় চিঠি শেষ হোক্ !

"ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে, ধীরে-ধীরে বেলা চলে যায়—
পত্রান্তরে দেখা হবে লইলাম এখন বিদায়।"

চারুলতা যখন বিড়ালের গলায় জয়পত্র বাঁধিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। বালিকা-স্বভাবসুলভ কৌতুকপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়াই যে তিনি উদ্ধৃত চার লাইন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও, যেরূপ অনায়াস-স্ফূর্ত্তিতে আলোচ্য শ্লোক রচিত হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কবিত্ব-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চারুলতার খাতায় প্রত্যেক কবিতার রচনা-কাল, এমন কি কয় মিনিট বা কয় ঘণ্টায় কবিতাবিশেষ রচিত হইয়াছিল তাহাও তিনি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কোথাও কষ্ট-সাধ্য রচনার প্রমান পাওয়া যায় না।

চারুলতার দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার কবি-হৃদয়ে শোকানুভূতি বেদনার সৃষ্টি করিয়া বজ্রকীটের ন্যায় ধীরে ধীরে কবির মর্ম্মস্থল কিরূপে ভেদ করিতে করিতে তাঁহার অন্তর্জগতে ট্রেজেডির সূচনা করিয়াছিল তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অবস্থাবিশেষিতা এই মহিলা-কবির ন্যায় বিষাদময় জীবন লইয়া বঙ্গভাষার শুধু অপর কোনও স্ত্রী-কবি

কেন, কোনও পুরুষ-কবিও আজীবন কাব্যশিল্পের চর্চ্চা করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। কবিত্ব-শক্তি লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শোকে তাপে তিনি কষ্ট পাইলেও তাঁহার সে শক্তি লোপ পায় না। কবির শোক অন্তর্দাহের যে চিত্র রচনা করে কবিত্ব-শক্তি তাহার রেখায় রেখায় ব্যথা-ভরা হৃদয়ের মূক ভাষা ব্যক্ত করিয়া দেয়। চারুলতার রচিত কবিতাবলী পাঠ করিয়া আমরা প্রিয়জনের মৃত্যু-জনিত কবির শোকের যে সংবাদ পাই তাহাতে ট্রেজেডির উপকরণ খুব বেশী নাই। শোকমাত্রই ট্রেজেডি নয়। চারুলতা এই প্রকার শোকে সময়ে সময়ে অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু সে শোকে তাঁহার হৃদয়কে চিরকালের জন্য অসাড় করিয়া ফেলে নাই। কবির আসল শোকের কারণ দেখা দিয়াছিল যখন তিনি দীর্ঘকাল রোগ-শয্যায় শায়িতা থাকিবার পরে বুঝিয়াছিলেন যে, ইহজীবনে তিনি অতঃপর স্বামী-সেবার অধিকারিণী হইয়াও কার্য্যতঃ তিনি স্বামীর সংসারযাত্রার সহায়রূপে কোনও কার্য্যের ভার লইতে পারিবেন না। বৎসরের মধ্যে আট নয় মাস যাঁহাকে শয্যাশায়িনী হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হয় তাঁহার জীবনের শত আশা, শত সাধ, কত শত কল্পনা রোগ-শয্যার পার্শ্বে আছড়াইয়া পড়িয়া যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসারে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় গৃহিণীর অক্ষমতা অনেক সময়ে যে শোকাবহ ঘটনাবলীর চিত্র লোক-নয়নের অন্তরালে অবরোধের মধ্যে নারীর মানস-পটে প্রতিফলিত করিয়া তুলে, চারুলতার লেখনী-মুখে তাহার বর্ণনা কাব্যাকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। চারুলতার রচিত পদ্যময় সুবৃহৎ আত্ম-জীবনীতে কবি-হৃদয়ের ট্রেজেডি পরিস্ফুট। এই অপ্রকাশিত রচনা বঙ্গভাষার কাব্য-সংসারে এক অভিনব ব্যাপার। শোক-দগ্ধ হৃদয়ের খণ্ড-চিত্র অনেক কবিই অঙ্কিত করিয়াছেন, চারুলতাও এই শ্রেণীর বিস্তর কবিতা রচনা করিয়াছেন। পুরুষ-কবিদের মধ্যে কেবল এক অক্ষয়কুমার বড়াল ব্যতীত অপর কেহ শোকের অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। অক্ষয়-কুমারের 'এষা'-কাব্য কবির বিপত্নীক জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। পতিবিরহকাতরা কোনও মহিলা-কবি 'এষা'-কাব্যের অনুরূপ কোনও কিছু রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোনও পুরুষ-কবিও যে নিজের দাম্পত্য-জীবনের শোকময় অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সে সংবাদও পাওয়া

যায় না। চারুলতার রচিত পদ্যময় আত্মজীবনী সেইজন্য যথার্থই কাব্য-জগতের এক অতুলনীয় অভিনব সৃষ্টি। দুঃখবাদ চারুলতার কবিত্ব-প্রতিভার প্রসাদাৎ বঙ্গণামার গার্হস্থ্য জীবনে যে ট্রেজেডি সম্ভবপর তাহার একখানি সুসম্পূর্ণ অখণ্ড .ফিল্ম রচনা করিয়া বঙ্গভাষার কাব্য-জগতে চারুলতার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। নারীর দুঃখের কথা আধুনিক সময়ে অনেক মহিলা গদ্যময় রচনার মারফৎ ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের আসরে গ্রন্থকর্ত্রীর কল্পনা রঙ্গমঞ্চের সবটা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। উপন্যাস-শ্রেণীর গদ্যময় রচনার সীমানার মধ্যে বাস্তবতার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কবি বা ব্যক্তি-বিশেষের আত্ম-জীবনের ইতিহাসেই সত্য ঘটনা বিবৃত হইয়া থাকে, কল্পনার প্রভাব সে ইতিহাসে সত্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার সুবিধা পায় না। চারুলতার রচিত পদ্যময় আত্ম-জীবনীতে কবির সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য প্রভৃতি মনোভাবের অভিব্যক্তি কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু তৎসমুদয় বিশেষরূপে পাঠককে জানাইয়া দেয়। চারুলতার জীবনী-সংগ্রহের দিক হইতে আলোচ্য রচনার মূল্য সেইজন্য সমধিক। এই রচনার আলোকে আমরা শুধু কবিকে বুঝিতে পারি না, তাঁহার রচিত অন্যান্য কবিতাগুলিরও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

চারুলতার রচিত পদ্যময় আত্ম-কাহিনী ১৯১৬ ছত্রে সমাপ্ত। কবি সমগ্র কবিতাটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবন-কাব্য ("শোভাময়ীর জীবন-কাব্য") চারুলতা ১৩:২ সালের চৈত্র মাসে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে শেষ করিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকায় শোভাময়ী নামে যে নায়িকার উল্লেখ আছে তিনিই চারুলতা। বিমলকুমার নামে কাব্যের নায়ক তাঁহার স্বামী গিরিজা বাবু। এই কাব্যে কবির পারিবারিক ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। সেই কারণে কবির রচিত উক্ত পদ্যময় আত্ম-কাহিনী প্রকাশিত হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে "সপ্তাহিক নায়কে" যদিও কয়েকটী শ্লোক উক্ত "জীবন-কাব্য" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু অনাবশ্যক ও কতকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কেবল একটি মাত্র শ্লোক ব্যতীত সেগুলিও এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

শোভাময়ীর যৌবনে দাম্পত্য-জীবনের সমুদয় সুখ ও শান্তি, আশা ও ভরসা যে চিরকালের তরে লোপ পাইবে সেই চিন্তাটা-ই অসহ্য ক্লেশদায়ক।

মানবের জীবন কাব্যে এত বড়, এমন ভীষণ, এরূপ মর্ম্মন্তুদ ট্রেজিক্ অনুভূতির লীলাভিনয় বিরল। সীতার দুঃখের অবসান হইয়াছিল। সুখভোগের পর পুনরায় তিনি অদৃষ্টের তাড়না সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চারুলতার দুঃখের বিরাম নাই, অবসান নাই। এমন একটানা দুঃখময় জীবন লইয়া কালাতিপাত করা যাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া কবি-জীবনের পালা সাঙ্গ করিয়াছেন, এমন একজন মাত্র মহিলা-কবির নাম ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাস্তবিক, ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের (Robert Browning) পত্নী স্বনাম-প্রসিদ্ধ মহিলা কবি এলিজাবেথ্ ব্যারেট্ ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning) ব্যতীত অপর কোনও পুরুষ বা স্ত্রী-কবি আজন্ম দেহ-পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিয়াও কাব্য-শিল্পের অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। ১৩২৪ সালে ষোল বৎসর বয়সে চারুলতা যখন "বনের ফুল" শীর্ষক বিষাদময় কবিতাটিতে লিখিয়াছিলেন—"উদাস হৃদয়ে একা আছি আমি, একটি নিরালা আগারে," সেই সময়ে তাঁহার যে ব্যাধি আরম্ভ হইয়াছিল ১৩৩৭ সালে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেই ব্যাধি যে কি কষ্ট দিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

চারুলতার বিষাদময় জীবনের একটিমাত্র সাথী ছিল যাহার নাম "সাহিত্য"—এই সংবাদও আমরা "শোভাময়ীর জীবন-কাব্যে" পাই। এগারো বারো বৎসর ক্রমান্বয়ে রোগভোগের পরে চারুলতার অবস্থা ১৩৩৫ সালে যখন অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল সে সময়ে চিকিৎসক, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে পুস্তক পাঠ করা বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে চারুলতা বলিয়াছিলেন—"পুস্তকের সঙ্গে নন্-কো-অপারেশন্ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে, আপনাদের অনুরোধে তাহা আমাকে করিতেই হইবে। আজ ৪।৫ দিন বই পড়ি নাই। টেবিলের উপরে দুই একখানা না-পড়া বই পড়িয়া রহিয়াছে, আজ তাহা ফেরৎ দিব। না পড়িয়া বই ফেরৎ দিয়াছি, এমন ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম।" ১৩২৫ সালের শেষ কিম্বা ১৩২৬ সালের প্রারম্ভে "শোভাময়ী" যখন স্বামীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন সে সময়েও তিনি রীতিমত সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছিলেন।

এই সময়ে একদিন চারুলতা স্বামীর সহিত ভাবী সপত্নীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিয়া আসেন।

"তোমার ভগিনী আমি—
বোন তুমি কনিষ্ঠা আমার,
আশা করি এই কথা
চিরদিন রাখিবে স্মরণে ;
ধরার দেবতা স্বামী
রমণীর জীবনের সার—
রাখিও অচল ভক্তি
নিশিদিন স্বামীর চরণে।"

চারুলতা ইহার পরে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়া ব্যথা-ভরা হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার কালিদাসের "মেঘদূতে" বর্ণিত যক্ষের ও যক্ষ-পত্নীর বিরহ-বেদনার স্মৃতির সহিত মিশাইয়া "শোভাময়ীর জীবন-কাব্যে" যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি মুখে যাহাই প্রকাশ করুন, কাযে যাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, সে সময়ে তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে জ্বালাময়ী অগ্নিস্রাব তাঁহার সমুদয় অস্তিত্বকে দগ্ধ করিতেছিল। সপত্নী-নির্ব্বাচনে যেটুকু রোমান্স বিষাদময়ীর জীবন-কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ট্রেজেডির ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল। নারী-হৃদয়ের রঙ্গভূমিতে এমন ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব যথার্থই কল্পনাতীত।

এইখানেই চারুলতা "শোভাময়ীর জীবন কাব্যের" প্রথম অংশ সমাপ্ত করিয়াছেন। কাব্য-শিল্পের দিক হইতে নাটকের প্রথমাঙ্ক যেখানে শেষ হওয়া উচিত, ঠিক সেইখানেই আলোচ্য "জীবন-কাব্যে"র প্রথম অংশ শেষ হইয়াছে। এই আত্ম-কাহিনীর প্রমাণ হইতে জানা যায় যে কবির বয়স তখন অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে ও তাহা হইলে ১৩২৬ সালে তিনি স্বামীর পুনরায় বিবাহে সহায়তা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক চারুলতার কবি-জীবনে সেইজন্য ১৩২৬ সাল স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় অনেকগুলি কবিতায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল। চারুলতার দাম্পত্য-জীবনেও এই বৎসর যে

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য জীবন কাব্যের প্রথমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে আমরা শোভাময়ীর সপত্নী লাভের সংবাদ মাত্র পাই। নব বধূ তখনো স্বামীর গৃহে পদার্পণ করেন নাই। দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হওয়ার পূর্ব্বে কবি আমাদিগকে শোভাময়ীর সপত্নীক জীবনের ঘটনাবলী কল্পনা করিয়া লইবার জন্য একটু সময় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

চারুলতা শোভাময়ীর "জীবন-কাব্য" ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে সমাপ্ত করেন অর্থাৎ কবির পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে চারুলতা অন্যান্য বিস্তর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত "জীবন-কাব্য" শেষ করিবার পর চারুলতা কিছু কম চারি বৎসর কাল জীবিতা ছিলেন। কবির জীবনের এই শেষ কয়েক বৎসরে যে সকল কবিতা তাঁহার লেখনী হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ কবিতা ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতায়, শিল্প-নৈপুণ্যে ও বৈচিত্র্যে সমসাময়িক কাব্য-জগতে উৎকৃষ্ট শ্রে র রচনার সামিল হইয়াছে। চারুলতা কোনও কালে কবি-যশঃ-প্রার্থিনী ছি ন না, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় তাঁহার রচিত খণ্ড-কবিতা আত্মীয় স্বজন ও সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে প্রকাশিত করিতেন। চারুলতা "বিচিত্রা" "পঞ্চপুষ্প" "মাতৃ-মন্দির", "অর্চ্চনা", "বামবোধিনী পত্রিকা", "জন্মভূমি", "বিকাশ", "বিশ্বজনীন" ও "পুষ্পপাত্র" ব্যতীত অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁহার রচিত খণ্ড-কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল কবিতা মাসিক পত্রিকায় তাঁহার জীবদ্দশায় বাহির হইয়াছিল সেগুলির সংখ্যা ন্যূনাধিক ৭০, কিন্তু যে সকল কবিতা প্রকাশিত হয় নাই সেগুলির সংখ্যা অনেক বেশী। চারুলতা দেবী পরলোক গমন করিলে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাসমূহে তাঁহার রচিত কবিতাবলীর প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

চারুলতা দেবীর কবিতাবলী ব্যতীত তাঁহার লেখনী-প্রসূত অনেকগুলি গল্পও একাধিক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গদ্যময় রচনা ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করিলে একখানি গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে। বঙ্গভাষার কাব্য-সংসারেই

কিন্তু চারুলতার যথার্থ স্থান। অবরোধের মধ্যে ব্যথা-ভরা হৃদয়ের যে গান তিনি আজীবন গাহিয়াছেন সেই বিষাদ-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি বঙ্গদেশে নারী-হৃদয়ের নিভৃত কুঞ্জে কোনও কালে নীরব হইবে না।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

ব্যথিতার গান।

বনের ফুল।

উদাস হৃদয়ে একা আছি আমি
　　একটি নিরালা আগারে,
শূন্য এ হৃদয় পূর্ণ কর নাথ !
　　পশিয়া মরম মাঝারে।
দুঃখ পেলে যদি পাই তোমা, হরি !
　　তবে দুঃখ দাও আমারে,
যদি সুখ মাঝে বাস কর, তবে
　　সুখ সহ চাহি তোমারে।
শোভাহীন আমি একটি কুসুম,
　　ফুটেছি সংসার-কান্তারে,
সৌরভ আমার সামান্য ভকতি,
　　দিব তা যতনে তোমারে।
নীরবে ফুটেছি, নীরবে ঝরিব,
　　মিশিয়া যাইব আঁধারে,
কাননের ফুল শুকাবে যখন,
　　কোলে তুলে নিও আদরে।

[১৩২৪, ১লা ফাল্গুনে রচিত—১৩২৭, "বিশ্বজনীনে" প্রকাশিত

প্রণাম।

পুত্রশোকে কাঁদে মাতা
ধরাতলে লুটিয়া লুটিয়া,
তখন আসিয়া যিনি
আঁখি-জল দেন মুছাইয়া—
মা বলে ডাকিয়া তার
লাঘবিতে চান হৃদিভার,
চরণ কমলে তাঁর
শতকোটি প্রণাম আমার।

শ্রাবণে সাজানো মেঘ
সযতনে আকাশের গায়,
অবিরল বারি ঝরে
পথ ঘাট সবি ভেসে যায় ;
গৃহ-হারা ভিজিতেছে,
দেখে মনে দয়া আসে যাঁর,
চরণ কমলে তাঁর
শতকোটি প্রণাম আমার।

পৌষমাসে ঘরে ঘরে
কাটা ধান রাখিছে তুলিয়া
ম্লান মুখে উপবাসী
সেই দিকে রয়েছে চাহিয়া।

যিনি বুঝিবেন মনে
কত ব্যথা মরমে তাহার,
চরণ কমলে তাঁর
শতকোটি প্রণাম আমার।

অতীতের স্মৃতিগুলি
সযতনে হৃদয়ে ধরিয়া,
অভাগা পতিত কাঁদে
অনুতাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া।
তখন আসিয়া যিনি
মুছাইয়া দেন অশ্রু তার,
চরণ কমলে তাঁর
শতকোটি প্রণাম আমার।

১৩২৬, ৪ঠা মাঘে রচিত—১৩২৭, "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত।

প্রেম।

বিগত হইলে নিশা শ্রীরাম হবেন নরপতি,
হেন কালে বনে তাঁরে বিমাতা দিলেন পাঠাইয়া!—
চতুর্দ্দশ বর্ষ-অন্তে ফিরি রাম আপনার দেশে
আগে বিমাতার পায়ে প্রণমিলা "মা" বলে ডাকিয়া।

পীলাত ঈশারে যবে বিনাশিল ক্রুশে বিঁধাইয়া,
অন্তিম সময়ে প্রভু বলিলেন সস্মিত আননে,—
"হে পিতঃ করিও ক্ষমা, এরা সব অবোধ অজ্ঞান,
তোমার সন্তানগণে পিতা তুমি রাখিও চরণে।"

"সর্ব্ব জীবে কর প্রেম" প্রচারিলা নিমাই যখন,
জগাই মাধাই তাঁরে প্রহারিল শত শত বার ;
আলিঙ্গিয়া দুইজনে বলিলেন শচীর কুমার,
"এসো, এই বুকে এসো, তোমরাও ভাই যে আমার।"

আরব প্রান্তর মাঝে ধূ ধূ করে উত্তপ্ত বালুকা,
মহম্মদ এসেছেন প্রচারিতে ধর্ম্ম ইসলাম ;—
অরাতি-প্রহারে তাঁর দেহে বহে শোণিতের ধারা,
মুখে বুলি—"ধর্ম্ম সত্য, সত্য হোক্ ঈশ্বরের নাম !"

যৌবনে ত্যজিয়া গৃহ শুদ্ধোদন রাজার নন্দন,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" দেশে দেশে করিলা প্রচার ;
ব্রাহ্মণেরা দিয়া বাধা সুচরিত্রে দিল অপবাদ,
হাসিয়া বলিল বুদ্ধ—"অমঙ্গলে মঙ্গল আমার।"

হে মহাপুরুষগণ, লহ আজি প্রণাম আমার,
তোমরা সকলে আজি দীন হীনে কর আশীর্ব্বাদ ;
বিতরিতে পারি যেন ধরনীতে স্নেহ, ক্ষমা, দয়া,
সহস্র দুঃখেও যেন হৃদয়ে না আসে অবসাদ।

[১৩২৬, ১৫ই চৈত্রে রচিত—১৩২৭, "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত]

আকুলতা।

হে দেবতা, কোন্ শুভক্ষণে
লুটিয়া পড়িব আমি হাসিমুখে তোমার চরণে ?
নিয়তির কশাঘাতে যে জীবন কাতর—চঞ্চল,
কবে সে তোমারে হেরি দুঃখ নিজ করিবে সফল ?

শুন নাকি তরুর মর্ম্মরে,
আমার প্রাণের ব্যথা কাঁদিয়া ফিরিছে ঘরে ঘরে ?
নিদাঘের সমীরণ ফেলিতেছে আকুল নিশ্বাস,
স্মরিয়া আমার দুঃখ অশ্রুধারা বরষে আকাশ।

নিয়তির নির্ম্মম লীলায়—
চেয়ে দেখ স্নেহময়, হারায়েছি শক্তি সমুদায়।
হৃদয়ে ধারণা নাই, ধৈর্য্য নাই বিবশ অন্তরে,
কল্পনা কাঁদিছে শুধু কামনার অন্ধকার ঘরে।

কবে তুমি প্রদীপ জ্বালিয়া—
আমার আঁধার ঘরে দীপ্ত মুখে দাঁড়াবে আসিয়া ?
তোমার আশীষ পেয়ে ভুলে যাব যত কিছু ব্যথা,
সত্য কি এ বিশ্বনাথ—নহে কি এ স্বপনের কথা ?

[১৩৩১, ১১ই জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৫, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

মহামিলন।

আমি যদি আগে চলে যাই—

অনন্ত আলোক-ভরা অজানিত দেশে
একেলা বসিয়া র'ব সাধিকার বেশে।
তোমার পথের পানে চাহিয়া থাকিব,
ধ্যানের প্রদীপ-শিখা জ্বালিয়া রাখিব।
অবশেষে প্রিয়তম আসিবে যখন,
তোমার চরণে লুটি' পড়িব তখন।

তুমি যদি আগে চলে যাও—

বিরলে বসিয়া আমি ভাবিব তোমায়,
কামনা উজ্জ্বল হবে তব কল্পনায়।
তুচ্ছ সংসারের শত সুখের বাসনা
ভুলিয়া করিব নাথ তোমার সাধনা।
পরিশেষে মৃত্যু যবে ডাকিবে আমায়,
বরিয়া লইব তারে তোমারই আশায়।

বহুদিন পরে—প্রিয়তম!

লোক-লোকান্তর দূর-দূরান্তর হতে
ভাসিয়া আসিবে যবে সময়ের স্রোতে
আমার আশার দিন নিকটে আমার,
তখন হেরিব আমি প্রতিমা তোমার
অন্তরে, বাহিরে—আর চিন্তা, ধারনায়,
একান্তে তখন আমি পাইব তোমায়।

আমারে হেরিব "তুমি"—তুমি হবে "আমি,"
মিলন সার্থক হবে সেইদিন স্বামী।

[১৩৩১, ৫ই ফাল্গুন রচিত—১৩৩৪, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

পূজা।

কি দিয়ে ভরিব ডালা, কি ফুলে গাঁথিব মালা,
কোন্ রত্নে সাজাব চরণ,
কোথায় পবিত্র বারি, কোথায় মঙ্গল-ঝারি,
কোথা মম পূজা-আয়োজন!
পঞ্চ দীপ আরতির, শঙ্খধ্বনি সুগভীর,
ধূপ-ধূনা চন্দন কোথায়,
আতপ তণ্ডুল আর যব তিল কুশ-ভার,
অর্ঘ্য-সাজ কোথা পাব হায়!
আমি আজি নিরজনে শুধু ভক্তিপূর্ণ মনে,
হেরিতেছি তব প্রতিকৃতি,
তোমার চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া তুলি'
ঢালিতেছি হৃদয়ের প্রীতি।
লুটিয়া লুটিয়া পায় বাসনা মিটেনা হায়,
তৃষাতুরা প্রাণের কামনা,
তোমারি জ্যোতির ভায় অন্ধকার দূরে যায়,
দীপ্যমান সহস্র কল্পনা।

প্রজাপতি স্নেহভরে আমারে তোমার করে
সঁপিলেন জীবন-ঊষায়,
সেই দিন হতে আমি স্মৃতির আসনে স্বামী,
প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমায়।
সাধ হয়—নিশিদিন হইয়া বিরামহীন,
পূজা করি চরণ তোমার,
ভুলে গিয়ে আপনারে, ভুলে গিয়ে বসুধারে,
ভুলি সদা সিদ্ধি সাধনার।
ধ্যানের ধারণা তুমি, তোমার চরণ চুমি
সুপবিত্রা ধরণী সুন্দরী,
পূজিতে তোমায় স্বামি, শক্তি কোথা পাব আমি,
তবু আছি মনে আশা করি।
প্রিয়তম, দাও বর, যেন যুগ-যুগান্তর,
ভাবি আমি তোমার মহিমা,
সংসার ভুলিয়া গিয়া, হৃদি পদ্মে বসাইয়া
পূজি যেন তোমার প্রতিমা।

১৩৩২, ১৪ই বৈশাখ রচিত—১৩৩৩ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত।

আশা।

বহুশত জনমের অভিলাষ দিয়া
রচিয়াছি আমি এক মধুর স্বপন,
আবেশ-বিহ্বল হয়ে আকুলিত হিয়া
করিয়াছে সেই স্বপ্নে আত্ম-বিসর্জ্জন।
চাহে না সে ধরণীর সৌন্দর্য্য-সম্ভার,
চাহেনা জ্বালিয়া দীপ উজ্জ্বলিতে ঘর;

চাহেনা ঢালিয়া দিয়া সুরের ঝঙ্কার
বহাইতে ধরাতলে অমিয়-নির্ঝর।
চাহে শুধু, আমরণ আপনা ভুলিয়া
স্বপ্ন-কল্পনার সুখে রহিতে ডুবিয়া।

২, ২৭শে ভাদ্র রচিত—অপ্রকাশিত]

উপেক্ষিতা।

স্নেহ-বিকশিত চোখে চাহিয়াছি যাহাদের পানে,
আমারে দিয়াছে তারা অবহেলা, ঘৃণা, অপমান,
করিয়াছে পরিবাদ,—দিবা নিশি ভাবিয়াছে মনে,
আমারে গড়েছে বিধি লয়ে বুঝি অয়স, পাষাণ!

দিনে দিনে বাড়ে ক্লেশ, কৃশতর অসুস্থ শরীর,
দুঃসহ বেদনা-স্রোতে অনুভূতি আত্ম-হারা আজ;
স্নেহ নাই—প্রীতি নাই—হাসি নাই বক্ষে ধরণীর;
নিয়তির চক্রে হায় অনুন্নত মানব-সমাজ।

বিমথিত বিদলিত শক্তিহারা হৃদয় আমার,
দিনে দিনে পলে পলে অন্তরের তৃপ্তি ক্ষীয়মান,
নয়নে মরমে ভাসে জগতের রুক্ষ ব্যবহার,
শান্তির আশায় শুধু ক্ষণে ক্ষণে আকুলিত প্রাণ।

জীবনের দীর্ঘপথে এইটুকু সান্ত্বনা আমার,
ততখানি সহিয়াছি যত শক্তি আছে সহিবার।

[১৩৩৩, ৮ই বৈশাখে রচিত—১৩৩৬, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

শেফালিকা।

ভোর না হতে ঘুমটি ভেঙ্গে আমার খুকুমণি
রান্নাঘরে চল্‌ল ছুটে মুখে "মা" "মা" ধ্বনি।
গায়ে একটি ফ্রক্-পরা,
উজল দুটি আঁখির তারা,
মৃদু মধুর হাসির আভায় দিপ্ত আনন খানি
রান্নাঘরে চল্‌ল ছুটে আমার খুকুরাণী।

হাতা নিয়ে খুন্তি নিয়ে উনুন-ধারে যায়,
জলের বাল্‌তি দেখ্‌তে পেলে হাত ডুবাতে চায়।
কড়ায় যদি দেখে দুধ—
"ই বাবা! তনম্ তুদ্"
বল্‌তে বল্‌তে খুকুমণি তিন পা পেছিয়ে যায়,
তরকারির খোসা নিয়ে দুধে ডুবিয়ে দেয়।

কাঠের পুতুল হাতে নিয়ে পিঁড়ির উপর ঘষে,
"বাত্‌না বাত্‌ছি", "বাত্‌না বাত্‌ছি" বলে মধুর হেসে।
ছোট একটি বঁটি নিয়ে
তরকারির খোসা দিয়ে
কুটনো কুটে, থালায় রেখে বলে হেসে হেসে,
"তল্‌কালি লেঁদেছি মাগো কাণ্ড বছে বছে।"

আমি যদি লিখ্‌তে বসি, অমনি দিয়ে চুমা,
বলে—"আমি লেখা ছিখ্‌ব, কলম দাও না মা!"
কেড়ে নিয়ে আমার কলম,
কথা বলে হরেক রকম,
"অ'য়েল্ হাতে লাথি দিলাম. অমনি হল 'আ'—
হচ্ছ-উ'য়েল্ পিথ্ ভাঙ্গলাম, দীল্‌ঘ'ঊ' হল ? বাঃ!"

জান্‌লায় বসে অবাক্ হয়ে গাছের পানে চায়,
"গাছ কেন মা দাঁলিয়ে আছে, ব্যথা হয় না পায় ?"
লহর ভাসে খালের জলে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে খুকু বলে,
"খাল কেন মা ছব ছময় ছুয়ে ঘুম যায় ?
নৌকা যাচ্ছে, লোক যাচ্ছে, ব্যথা হয় না গায় ?"

আমার খুকু, আমার মেয়ে, আমার "শেফালিকা,"
আঁধার ঘরের মাণিক আমার, আমার প্রাণাধিকা।
দেব-চরণে যুক্ত করে
ভিক্ষা মাগি করুণ-স্বরে,
এবার যেন বেঁচে থাকে আদরের লতিকা,
দুই বছরের মেয়ে আমার ছোট শেফালিকা।

[১৩৩৩, ১০ই জ্যৈষ্ঠ রচিত—অপ্রকাশিত]

অবশেষে।

প্রতীচি আসার কোলে জ্বলে রক্ত-রেখা,
পূর্ব্বদিক ভরে গেল তিমির-লেখায়.
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আজ বসে আছি একা
স্পন্দমান হিয়া লয়ে মহা প্রতীক্ষায়।
কেটে যাবে মাস, বর্ষ, জন্ম, জন্মান্তর,
ভবিষ্যের যবনিকা তুলি' একদিন
স্নেহস্পর্শে জাগাইয়া প্রসুপ্ত অন্তর
আমার বাঞ্ছিত হবে আমাতে নিলীন।
সেদিন রবেনা শশী, রবেনা তপন,
কর্ত্তব্যের অন্তরাল থাকিবে না আর,
বিবাহ-যজ্ঞের হবে সমাপ্তি তখন—
সম্মিলিত হিয়া হবে নির্ম্মাল্য ধাতার।
হতে পারে এ জগৎ অভিনয়ময়,
বহ্নি-পূত প্রেম কিন্তু সত্য-মৃত্যুঞ্জয়।

১৩৩৩, ২রা মাঘ রচিত—১৩৩৪, "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত

কেন ?

জীবন প্রদীপ যদি, সহস্র ফুৎকারে
কেন প্রভু, কেন তবে নিভিয়া না যায় ?
জীবন কুসুম যদি, বেলা-অবশেষে—
কেন প্রিয়তম, তবে ঝরিতে না চায় ?
জীবন যদ্যপি তব স্নেহ-আশীর্ব্বাদ,
আনন্দ জাগে না কেন চারিদিকে তার ?
তুমি যদি হও প্রভু জীবন সবার,
স্পন্দহীন কেন তবে জীবন আমার ?

[১৩৩৪, ২৭শ অগ্রহায়ণ রচিত—১৩৩৬, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

প্রহেলিকা ।

জ্বলিয়া জ্বলিয়া দীপ ওই দেখ গিয়াছে নিবিয়া,
ওই দেখ সমীরণে ভেসে যায় উত্তাপ তাহার ;
দেরী নাই প্রিয়তম, মহাকাল আছে দাঁড়াইয়া—
এখনি বিলুপ্ত হবে জীবনের সত্তাটুকু তার ।
বাজিয়া বাজিয়া বীণা এইবার গিয়াছে থামিয়া,
এখনো সমীরে দেখ ভেসে যায় সুরের ঝঙ্কার ;
দেরী নাই—দেরী নাই—মহাকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া
ধীরে ধীরে মুছে দেবে স্বপনের আবেশ তাহার ।

ফুটিয়া ফুটিয়া ফুল বনপ্রান্তে পড়িল ঝরিয়া,
এখনো বাতাসে আছে সুরভিত নিশ্বাস তাহার ;
দেরী নাই প্রিয়তম, নিয়তির আকুলিত হিয়া—
শেষ হবে—লুপ্ত হবে সুমধুর স্মৃতি-রেখা তার।
আলো গেছে, গান গেছে, ঝরে গেছে আনন্দের ফুল,
আমি শুধু বেঁচে আছি—একি নাথ, হৃদয়ের ভুল ?

[১৩৩৪, ২রা কার্ত্তিক রচিত—১৩৩৬, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত

মিলন-তৃপ্তি।

জানি আমি—জানি প্রেমময়,
আমারি কারণে তব উদ্বেলিত বিবশ হৃদয়।
সংসারে আনন্দ আমি, প্রীতি আমি জীবনে তোমার,
আমার মুখের হাসি হরে তব হৃদয়ের ভার।

সুবিস্তৃত অদৃষ্ট সরণী—
অবিশ্রান্ত বক্ষে তার ভ্রমিতেছ দিবস রজনী।
নাহি তন্দ্রা—নাহি তৃপ্তি—মর্ম্মে নাই সংগ্রামের ভয়,
আমারি কারণে শুধু আকুলিত তেজস্বী হৃদয়।

আজ নয়—বহু যুগ হতে
চাহিয়া আমার পথ ভ্রমিতেছ জগতে জগতে।
চলে গেছে কোটি কল্প—চলে গেছে জন্ম-জন্মান্তর,
কাল-স্রোতে ভাসে শুধু কামনার চিত্র অনশ্বর।

কর্ম্মফল এ ছবির বুকে
ইন্দ্র ধনু-বিনিন্দিত বর্ণ ঢালে পরম কৌতুকে।
মহাব্যোম-পারাবার হিল্লোলিয়া উঠি' অনুক্ষণ
এই চিত্র-প্রতিচ্ছায়া দিগন্তরে করিছে প্রেরণ।

তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম আমি,
আবেগ-কম্পনে এই কাঁপিতেছি প্রতি দিবা যামী।
তুমি চাহিয়াছ তাই আসিয়াছি চরণে তোমার,
তোমারি আকুল আশা স্পন্দমান হৃদয়ে আমার।

সৃজনের প্রথম নিশায়—
বিশ্ব চরাচর যবে লুপ্ত ছিল তমসা ধারায়,
সেইক্ষণে প্রজাপতি দুটি প্রাণ একত্র করিয়া
করিলেন সঞ্জীবিত মন্ত্র-পূত শক্তি সঞ্চারিয়া।

হেরিলাম আনন তোমার,
হেরি' সে অপূর্ব্ব কান্তি ভুলিলাম সত্তা আপনার।
জ্যোতির্ম্ময় ছবি তা কল্পনার ফলকে আঁকিয়া
রূপ-লালসার স্রোতে চলিলাম ভাসিয়া ভাসিয়া।

আসক্তির সেই বহ্নি শিখা,
সৃজিল হৃদয়ে মম বাসনার দীপ্তি-মরীচিকা।
পাশাপাশি বাস করি, তবু যেন পরিচয় নাই!
থাকিয়া চরণতলে কর্ম্মফলে আপনা হারাই।

কত যুগ গিয়াছে বহিয়া—
মহাশূন্যে নিশি দিন ভ্রমিতেছি তোমারে চাহিয়া।
বিরতি জানিনা প্রভু, শিখি নাই প্রেমের সাধনা,
আশার বৈচিত্র্যে শুধু সুচিত্রিত করেছি কল্পনা।

তবু তুমি স্নেহ-ভরে আজ—
চরণে দিয়েছ স্থান—ওগো প্রিয়, রাজ-অধিরাজ !
আমারি কারণে তব প্রতিক্ষণে হৃদয় আকুল,
জীবনের পথে তাই চলিতেছে সংগ্রাম বিপুল।

বহিয়াছে প্রবল ঝটিকা,
নিয়তি বাজায়ে বাঁশী গাহিয়াছে বিরহ-গীতিকা।
আসিয়াছে কতবার দূরতার দৃপ্ত ব্যবধান,
তুমি চির অবিকল, তোমাতেই সমাহিত প্রাণ।

[১৩৩৩, ৫ই মাঘ রচিত—১৩৩৪, "বিচিত্রায়" প্রকাশিত]

মাঙ্গল্য।

পুরুষের প্রীতি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ক্ষমা, প্রণয়-গৌরব,
যে নারী করেনি অনুভব,
ধরা তার মরুভূমি—চিত্ত তার পাষাণ সমান,
সংসারের বুকে শুধু জ্বালিবে সে অগ্নি অনির্ব্বাণ ;
সেই দুঃখিনীর তরে বিভু-পদে প্রার্থনা আমার—
ধৈর্য্য-উৎস বহে যেন শিলীভূত হৃদয়ে তাহার
প্লাবিয়া সংসার।
"পরিণাম রমণীয়" নিদাঘের দিবস সমান
জাগে যেন কল্যাণ মহান্।

যে পুরুষ বুঝে নাই রমণীর হৃদয়ের ভাষা,
তার বুকে জাগিবে পিপাসা।

সেই তৃষাতুর হিয়া ব্যোম-পথে ভ্রমণ করিয়া
অভিশপ্ত আশা ঢালি ধরণীরে রাখিবে ঘিরিয়া ;
সুখ, শান্তি অভিলাষ দূর হতে হেরিয়া তাহারে
মরীচিকা-অন্তরালে লুকায়ে রাখিবে আপনারে
গোপন আগারে।

সে অভাগার তরে বর মাগি দেবের চরণে,
তৃপ্তি যেন জাগে তার মনে।

১৩৩৪, ৩রা বৈশাখ রচিত—১৩৩৩, মাঘ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত।

অভিলাষ।

আমি চাই দেখিবারে দেশের গৌরব,
সকলেই ক্ষমাবান, স্নেহ-দয়া-পূর্ণ প্রাণ,
সমীরে বহিয়া যায় যশের সৌরভ।
সবাই আপনাহারা, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা,
অপরের দুঃখ প্রাণে করে অনুভব ;
মায়ের বসন নাই, উপবাসী বোন, ভাই,
তাই দেখে না থাকে যে হইয়া নীরব,—
অভিমান, অহঙ্কার, দূরে করি পরিহার,
প্রতীকার করিতে যে চাহে এই সব ;
তাহারি চরণ তলে, পুষ্পাঞ্জলি দিব ঢেলে,
জানিব সে এ জগতে প্রকৃত মানব।

আমি নই তুচ্ছ—দীন, একটুও নহি হীন,
একা একা আছি তাই হয়ে আছি শব,
পাপ-তাপ দূরে ঠেলি এস, এস, সবে মিলি,
জাগাইব ভারতের অতীত গৌরব।
কেন একা পড়ে র'ব, দুঃখ-ক্লেশ কেন স'ব,
সকলি করিতে পারি আমরা মানব!
ফিরাইতে চাহি তাই দেশের গৌরব।

[১৩২৬, ১০ই আষাঢ় রচিত—১ম বর্ষ "বিকাশে" প্রকাশিত]

সাফল্য।

জীবনের হাসি-খেলা প্রতি পলে পলে
মিশে যায় অতীতের অজানিত দেশে,
শত আশা জেগে উঠে মরমের তলে
তখনি ঝরিয়া পড়ে শোভাহারা বেশে।

ফুটিতে ফুটিতে অশ্রু শুকাইয়া যায়,
হাসিটিও চাপা থাকে অধরের কোণে,
বলিবার কথাগুলি মনেই মিলায়—
জীবন ঢলিয়া পড়ে মরণ-শয়নে।

না ফুরাতে দিবসের ছোট কাজগুলি,
রজনী আসিয়া করে প্রভাব বিস্তার,

প্রতি নিমেষের সাথে দূরে যায় চলি'
হৃদয়ের আশা-ভরা স্বপন-সম্ভার।

আমি জানি সফলতা মনোরম সাজে
জেগে থাকে জীবনের ব্যর্থতার মাঝে।

[১৩২৭, ১লা আশ্বিন রচিত—১৩২৯ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত

ভিখারিণী।

জগতে রয়েছি আমি আমিত্বের ছবিখানি
ফুটাইয়া হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে,
আর ত লাগে না ভাল, ওগো নাথ! বল, বল,
কি করিতে পারি আমি জগতের তরে?
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ কোথায় করিব দান,
কি কাজে সমর্থ হবে এ দীন হৃদয়?
কার প্রয়োজন তরে দিতে পারি আপনারে,
আজ তা প্রকাশ করে বল দয়াময়।
সুখ-স্বাস্থ্য-স্বস্তিহারা জীবন বিষাদে ভরা,
অবসাদে দেহ-মন নিয়ত পীড়িত,
দীনতায় ভরা হিয়া কোন্ কাজে সমর্পিয়া,
বল গো করিতে পারি কাহারে প্রীণিত?
করি না কিছুই কাজ, মনে তাই জাগে লাজ,
নিয়ত ক্ষুভিত তাই ব্যথিত অন্তর,
দাঁড়াতে লোকের পাশে মরমে সঙ্কোচ আসে,
দারুণ যাতনা বুকে বাজে নিরন্তর।

কারো মুখে যদি শুনি স্নেহ ভরা দুটি বাণী,
সরমে সঙ্কোচে যেন মাথা কাটা যায়,
শুনি যদি তিরস্কার, বুকে জাগে হাহাকার,
আমার কিছুই নাই সদা মনে হয়।

যুড়িয়া যুগল হাত চরণে এসেছি নাথ!
এ প্রবল যাতনার প্রতিকার তরে,
সুখ লও, শান্তি লও, শরীর ভাঙ্গিয়া দাও,
যাতনা-আগুন জ্বালো হৃদয়ের ঘরে।

কিছু বলিব না আমি, কভু করিব না স্বামি!
এ সব অভাব তরে অনুযোগ পায়,
লইয়া চরণ-ধূলি আজ শুধু এই বলি,
দুটি তুচ্ছ কাজ দাও করিতে আমায়।

[১৩১৬, ২৮শে শ্রাবণ রচিত—অপ্রকাশিত]

পুরস্কার।

আঁধারে ছিলাম আমি,
প্রাণে ছিল বিষাদ কালিমা,
জ্বালিয়া স্নেহের আলো,
দেখায়েছ আলোক-সুষমা।
চারি দিকে চেয়ে দেখি,
জাগিতেছে তোমারি আদর,

করুণা-প্রভায় তব
উজলিত মানবের ঘর।
যখন ছিলাম আমি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ লয়ে,
বুঝিতে পারিনি দেব
কত শোভা ধরার হৃদয়ে।
আজ আমি ঘরে বসে
ছাড়িয়াছি আপন আলয়,
তাই দেখি তরু-লতা
জীব-জড় সবি শোভাময়।
ছুটেছে তটিনী-বক্ষে,
তোমারই স্নেহ-নির্ঝরিণী,
সমীর শ্রবণে নাথ!
বলে তব প্রেমের কাহিনী।
ভাসিছে তোমার কান্তি
প্রকৃতির লাবণ্য-সম্ভারে,
ধ্বনিছে তোমারি গাথা
বিহঙ্গের ললিত ঝঙ্কারে।
নিশায় আঁধার আসি
ঘিরে রাখে সুষমা ধরার,
তার মাঝে দেখি আমি
শান্ত, দীপ্ত চাহনি তোমার।
জানায় ধরার শোভা
তুমি নাথ কত শোভাময়,
পুলকে, বিস্ময়ে তাই
বিমোহিত আমার হৃদয়।

পীড়িত, দলিত আমি,
এ ত' নয় দুঃখের কারণ,-
পীড়াই এখন দেব,
ফুটায়েছে আমার নয়ন।

[১৩২৭, ৮ই মাঘ রচিত—অপ্রকাশিত]

আবেদন।

জগদীশ.

কাতরে মিনতি করি চরণে পড়িয়া,—
নয়নের দিঠি মোর নিওনা হরিয়া।
তোমার সাজান ধরা
সহস্র সৌন্দর্য্যে ভরা,
দেখিব অনন্তকাল নয়ন ভরিয়া!—
এ সাধে সেধোনা বাদ নিঠুর হইয়া!

পুণ্যতোয়া দেবনদী ওই বয়ে যায়,
উছলি বীচিমালা বুকে শোভা পায়!
শত চূর্ণ রবি-কর
পড়েছে তাহারি' পর,
গলিত হিরণ যেন তরল আভায়
জলের প্রবল টানে আপনা হারায়!

পড়েছে রবির আলো শ্যামল শাদ্বলে,
বনচর পশু কত ফিরে তরু-তলে !
পরিয়া বলাকা মালা
শোভে হিমালয়-বালা ;—
আছাড়িয়া পড়ি ঊর্ম্মি পুলিনের গায়
ধরণী উজ্জ্বল করে অমর শোভায় ।

সুদূরে জাহ্নবী পারে শ্যাম বন-রেখা
শোভিছে, ধাতার যেন চারু চিত্রলেখা !
এ পারে প্রান্তর মাঝে
শুষ্ক লতা পাতা রাজে,
সমীর আপনা-হারা বন-ফুল-বাসে,
শীকর-সম্ভারে নরে মাতায় উল্লাসে !

বিস্ময়-প্রফুল্ল চোখে চেয়ে দেখি আমি
অপরূপ শোভাময় শ্যাম বন-ভূমি !
নব কিশলয় দলে
তপন-কিরণ জ্বলে,
প্রভাতী গাহিছে পাখী বসিয়া শাখায়,
উল্লাসে অমর নদী সাম গান গায় ।

প্রশান্ত জলধি যেন শোভিছে আকাশ,
রবি-আভা হাসে তাতে কনক-সঙ্কাশ !
ফেন-ফুল-দাম সম
মহামেঘ নিরুপম
ভেসে যায় তারি মাঝে অনন্ত অসীমে,
নয়ন ধাঁধিয়া যায় মধুর নীলিমে ।

সাজুয্য চাহি না নাথ, ধরণীর সাথে,
বর দাও, আমি যেন থাকি আপনাতে।
আপনার জ্ঞান লয়ে
এই মত চেয়ে চেয়ে
দেখি যেন ধরণীর শত শোভারাশি,
প্রকৃতির সাথে যেন প্রাণ খুলে হাসি।

প্রণাম করিয়া বলি চরণে তোমার,
ফিরিয়া নিওনা দেব চাহনি আমার।
অন্তরে ত জান স্বামী,
তোমারি প্রণেয় আমি !
নিয়েছ অটুট স্বাস্থ্য, তাতে কাঁদি নাই,
নয়নের দৃষ্টি আমি চিরতরে চাই।

[১৩২৭, ২৩শে চৈত্র রচিত—১৩২৮, "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত

কামনা

মরে গিয়ে আবার যদি ফিরে আসি আমি,
আমায় তুমি কুসুম কোরো ওগো জগৎ স্বামি !
ফুটে ফুটে গন্ধ ঢেলে
লুটিয়ে পড়্‌ব ধরার কোলে,
সমীরণ যাবে আমার সুবাস চুমি চুমি,
ফিরে জন্মে আমায় দেব কুসুম কোরো তুমি !

আমায় তুমি প্রদীপ কোরো ওগো বিশ্বরাজ !
আঁধার ঘরে আলোক দিয়ে কর্‌ব কিছু কাজ।
ছোট একটি ঘরের কোণে
জ্বল্‌তে থাক্‌ব সঙ্গোপনে,
ঊষা যখন আস্‌বে নেমে প'রে রাঙ্গা সাজ,
তখন ফিরে যাব ঘরে সেরে আপন কাজ।

আমায় তুমি কোরো প্রিয় সাঁঝের সমীরণ,
দিগ্‌বিদিকে বয়ে যাব হ'য়ে আনমন।
শিখর-বালা হাসিমুখে
আমার স্মৃতি লয়ে বুকে,
দেশ বিদেশে ছুট্‌বে সুখে গেয়ে মধুর গান,
তারি সঙ্গে ছুট্‌ব আমি মিশিয়ে প্রাণে প্রাণ !

| ১৩২৮, ৫ই জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩২৯ "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত

মিনতি।

মরণ যখন আস্‌বে চ'লে
আমায় তুলে নিতে কোলে,
তখন আমায় দিও ভিক্ষা জগতের নাথ,
একটী মধুর করুণ দিঠি,
উঠ্‌বে যাতে বিশ্ব ফুটি'—
উঠ্‌বে ফুটে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত !

স্নেহের ছবি সুখের জ্যোতি,
প্রীতির শোভা, প্রেমের নতি,
বিফল-ব্যথা, আকুল সাধ আমার পারিজাত,
একে একে সকল ভাষা,
জীবন ভরা কাঁদা হাসা,
সবই যেন আঁখির পাতায় হয় গো প্রতিভাত !—
শেষ দিবসে এই ভিক্ষা দিও আমায় নাথ।

[১৩২৮, ২৪শে অগ্রহায়ণ রচিত—১৩২৯, "বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত"

সমস্যা।

বীজন জীবন বনে
একেলা ভ্রমিয়া মরি,
'কে আমার' 'আমি কার'
কিছু না বুঝিতে পারি।
যতদূর দৃষ্টি যায়,
শুধু শূন্য—শুধু কালো,
দিগন্ত আঁধারে ভরা—
কোথাও জাগে না আলো।
নিবিড় কানন মাঝে
একেলা ভ্রমিব কত!
এত চলি—তবু আর
ফুরাতে চাহে না পথ।

কোন্ দেশে যেতে হবে
তাহাও জানিনা আমি,
জানিনা কোথায় গেলে
ফুরাবে অনন্ত যামী।
কোথা হতে আসিয়াছি
তাও আজ নাই মনে,
জানিনা চলেছি কোথা
আকুল উদাস প্রাণে।
রেশম-কীটের মত
পড়েছি রহস্য জালে,
এ জাল ছিঁড়িতে আমি
পারিব কি কোন কালে?

[১৩১৮, ৮ই পৌষ রচিত—অপ্রকাশিত]

বর্ষা নিশীথে।

"আকাশ জলদে ভরা"
তমোময়ী বসুন্ধরা,
চারিদিকে আলোকের লেশ মাত্র নাই
ঊর্দ্ধে নীহারিকা-পথে
গভীর তমসা-স্রোতে
অগণ্য জ্যোতিষ্ক রাশি বিলুপ্ত সবাই।
ঝর্ ঝর্ বারি ঝরে,
বায়ু বহে ভার স্বরে,

ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে বিজলী জ্বলিয়া ;
সে তীব্র আলোক-আভা,
বাড়ায় মেঘের শোভা,
ধরণীর ম্লান মুখ উঠে উজলিয়া।

নাই জন-কোলাহল,
প্রাঙ্গনে জমিছে জল,
প'ড়ে আছে রাজপথ পথিক-বিরল ;
উন্মাদ সমীর বেগ,
আকাশে ডাকিছে মেঘ,
স্ফীত বক্ষ খাত আজি হয়েছে প্রবল।

কাঁদে নীড়-হারা পাখী,
হেলিয়া পড়িছে শাখী,
পুরাতন গৃহগুলি উঠিছে কাঁপিয়া ;
আবর্ত্ত পুষ্কর আজ
পরিয়া রুদ্রের সাজ
দিতেছে প্রলয়-স্মৃতি মনে জাগাইয়া।

দাঁড়াইয়া বাতায়নে,
বিস্ময়-চকিত মনে,
হেরিতেছি প্রকৃতির ভীষণ মূরতি ;
আঁধারে আবৃত দিশা,
দ্বিতীয় প্রহর নিশা
ম্লান মুখে জলধরে করিছে আরতি।

[১৩২৯, ১০ই শ্রাবণ রচিত—১৩৩৩, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

প্রলয়ে।

স্মরণ অতীত কালে বেজেছিল প্রলয় বিষাণ,
সপ্ত সাগরের বুকে উঠেছিল গভীর তুফান।
আকাশ, বাতাস, ধরা অন্ধকারে মিশায়ে আপনা
দিকে দিকে করেছিল প্রলয়ের প্রবল ঘোষণা।
তার পরে ধীরে ধীরে পূর্ব্বাশার দিক্-চক্রবালে
হাসিয়া উঠিল রবি বরষিয়া স্বর্ণ-কর-জালে।
প্রথম আলোকে সেই উজলিত নিখিল ধরণী,
সেই সুপবিত্র হাসি জগতের বিশল্যকরণী।
ধরণী চাহিয়া আছে রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ-মৌন মুখে
দূর ভবিষ্যের পানে ; কবে নিশা যাইবে টুটিয়া—
রবির কনক রেখা কতদিনে উঠিবে ফুটিয়া !
কখনো নিস্ফল নয় জীবনের কঠোর সাধনা,
আজি এ প্রলয় তাই করিতেছে মঙ্গল-ঘোষণা।

(১৩৩২, ১৮ই বৈশাখ রচিত—১৩৩২ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত)

প্রার্থনা।

ঝরিবে না অশ্রুজল আর
অন্তরের অন্তঃস্তলে মিশিবে না মৌন হাহাকার।
মিশিবে না সমীরণে বেদনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
আমার করুণ দৃষ্টি আর নাহি হেরিবে আকাশ।

সব আমি ভুলিব এবার,
ভুলে যাব জীবনের যত কিছু সঞ্চয় আমার।
ভুলে যাব হৃদয়ের লক্ষ লক্ষ কামনা বাসনা,
ভুলিতে চাহিব আমি প্রণয়ের নীরব সাধনা।
সংসারের শত অবহেলা—
অতি ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছতম আনন্দের মেলা,
হাসি, অশ্রু, অভিলাষ, আকাঙ্খার কুঙ্কুম আলোক,
মিশিবে বিস্মৃতি বক্ষে জগতের অনন্ত পুলক।

শুধু প্রভু, চাহি এই বর,
অনাগত দিন গুলি পরিপূর্ণ করি' নিরন্তর
তোমার মধুর নাম হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
চিরদিন উজলিয়া থাকে যেন অমর অক্ষরে।

[১৩৩১, ২৮শে আশ্বিন, রচিত — ১৩৩৩, "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

সার্থক।

কাননে ফুটিল ফুল,—জানি আমি জানি—স্নেহময়,
ফুটিল সে তোমারি ইচ্ছায়,
ঢালিয়া মধুর শোভা উজলিয়া প্রকৃতি-হৃদয়
সুরভিত করিবে ধরায়।

আয়ু-অবশেষে ওই বন প্রান্তে পড়িল ঝরিয়া,
জানি আমি—দেবতা আমার!
তুমিই করিয়া স্নেহ শ্রীচরণে লইলে ডাকিয়া
করি' নিজ পূজা-উপচার।

কোন দিকে চিহ্ন নাই,—হৃদয়ের আনন্দ আমার
আমি কিছু করিনা বিষাদ,
জানি সে কৃতার্থ আজ, নাই কিছু বেদনা তাহার
পেয়ে তব স্নেহ-আশীর্ব্বাদ।

[১৩২৪, ৭ই আষাঢ় রচিত—১৩৩১, ''পঞ্চপুষ্পে'' প্রকাশিত]

অর্চ্চনা।

ধীরে ধীরে ঘনীভূত সান্ধ্য অন্ধকার,
অস্তমিত দিগন্তে তপন,
শান্ত সমাহিত চিত্তে পূজা-উপচার
সাজাইল প্রকৃতি তখন।

কুসুমের অর্ঘ্য নহে, কিশলয় দলে
পূর্ণ নয় আরতির ডালা,
ঝিল্লী-রবে মধু-গীতি আজি না উথলে,
গাঁথে নাই সুচিকণ মালা।

দিবা অবশেষে যায় অতীতে মিশিয়া
আলোকের আনন্দ-ঝঙ্কারে
সেই মূর্চ্ছনার সাথে মিশিল আসিয়া
সুমধুর সঙ্গীত নিশার।

চেতনার স্মৃতি আর স্বপ্ন-সমাধির,
লয়ে এই প্রীতি উপহার,
বিশ্ব-দেবতার তরে আজি প্রকৃতির
বক্ষে জাগে শান্তি বন্দনার।

১৩১৪, ৮ই ভাদ্র রচিত—১৩১৩ "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

প্লাবন।

এখন গভীর নিশা, চিত্রার্পিতা দিগঙ্গনাগণ,
ধরণী সুপ্তির কোলে ঢালিয়াছে অঙ্গ আপনার ;
শীতল চন্দ্রিকা-স্নাত মহাকাশ ধ্যান-পরায়ণ—
ধরিয়া রূপের বেশ ভ্রমিতেছে সঙ্গীত-ঝঙ্কার।
কণ্ঠ আজি বিনিশ্চল,—শব্দহারা প্রকৃতির ভাষা,
মহাসমাধির অঙ্কে লুপ্তপ্রায় সুরের উচ্ছ্বাস ;
চুম্বিত-ধরণী-বক্ষ স্বর্লোকের সৌন্দর্য্য-পিয়াসা
মৃত্তিকার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালিয়াছে আনন্দ-আভাস।
চেয়ে আছি মুগ্ধ চোখে—নাই আজ নয়নে পলক,
দেখি শুধু দিকে দিকে ফুটিয়াছে আলেখ্য মধুর ;
সঙ্গীত-প্রতিভূ হ'য়ে হাসিতেছে, রূপের আলোক,
নভশ্চ্যুত চন্দ্র রশ্মি শান্ত রূপে জাগায়েছে সুর।
রূপকের আবরণ—অন্তরের সাধনা ভেদিয়া
হে অরূপ ! শান্তি-স্রোতে দাও আজি আমারে প্লাবিয়া।

১৩৩৫, ১৪ই শ্রাবণ রচিত—১৩৩?, "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

অভিলষিত।

সমাপ্তি চাহিনা প্রিয়, চাহিনা বিরতি,
প্রশান্ত জীবনে নাই কামনা আমার ;
ইন্দ্রিয়ের শত জ্ঞান—সহস্র মিনতি—
করিতে চাহিনা আমি দূরে পরিহার।

আমি চাহি,—যে ঐশ্বর্য্য দিয়াছ আমায়,
লয়ে তার অভিলাষ—লয়ে তার সুখ,
জীবন-তরণী যেন ধীরে ব'য়ে যায়
সময়-জলধি-গর্ভে লইয়া কৌতুক।
আসে যদি ঘূর্ণাবর্ত্ত—ঝটিকা প্রবল,
অদৃশ্য নিয়তি যদি সম্মুখে দাঁড়ায়,—
তথাপি হৃদয় যেন না হয় চঞ্চল,
ধারনা কাঁপেনা যেন বিপদ-ছায়ায়।
অন্তরে বাহিরে রেখে প্রতিমা তোমার,
অনন্ত সংগ্রামে যেন লভি অধিকার।

[১৩৩৪, ১৮ই কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত]

আভাস

অন্ধকার— ঘোর অন্ধকার !
অন্ধকারে ডুবিব কেমনে ?
আঁখি দুটি মুদিয়া সভয়ে
রহিলাম গুপ্ত গৃহকোণে।
মেলিলাম নয়ন যখন,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে,
কোথা ভয় ?—তমসা কোথায় !
কার রূপে বিশ্ব গেছে ছেয়ে।

[১৩৩৫, ২৫শে আষাঢ় রচিত—১৩৩৫, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে নাথ, পারিনা কি ধরিতে তোমায় ?
কেমনে অম্বুধি তবে মানচিত্রে উঠিছে ফুটিয়া !
কেমনে কুসুম হাসে অপরূপ বর্ণ-সুষমায় ?
জোনাকির অঙ্গে কেন দীপ্তিরাশি ওঠে বিভাসিয়া ?

অনাদি অনন্ত কাল ধরণীর প্রতি আবর্ত্তনে
যে মহাগীতের সুর ঝঙ্কারিয়া উঠে অনুক্ষণ,
কাষ্ঠের বীণায় তাহা সপ্তসুরে ধ্বনিল কেমনে ?
অণু-পরমাণু-বক্ষে জাগে কেন অসীম স্পন্দন ?

কোথা—কতদূরে রবি, কত নিম্নে ক্ষুদ্রতমা ধরা,—
কেমনে হৃদয়ে তার ভেসে আসে অনন্ত কিরণ ?
কল্পনার কল্প-রাজ্য সীমাহারা বর্ণে-গন্ধে ভরা,
মানব-হৃদয়-পটে ভাসে তার আলেখ্য কেমন !

ক্ষুদ্রতার বক্ষে যদি বৃহত্ত্বের এত সমাবেশ—
আমার হৃদয়ে তুমি জাগিবেনা ওগো পরমেশ ?

১৩৩৪, ১৮ই ভাদ্র রচিত—১৩৩৪, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

অশেষ।

ফুরাতে চাহেনা বেলা, স্বপ্ন অনুরাগ লয়ে
পলে পলে বাড়িছে সময়,
বর্ত্তমানে আবেষ্টিয়া ভবিষ্য আকুল হয়ে
আঁকে কত ছবি জ্যোতির্ম্ময়।
হৃদয়-তটিনী তীরে
কামনা নাচিয়া ফিরে
হাসি মুখে উড়াইয়া কেশ ;
বিরলে বসিয়া স্মৃতি জীবন-আলেখ্য-পটে
করে শত বর্ণ-সমাবেশ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রু-হাসি
সহসা লভিয়া সম্প্রসার
কালের বিশাল বক্ষে আনন্দ উঠিয়া ভাসি
পূর্ণ করে ব্যোম-পারাবার।
অর্দ্ধস্ফুট কত রেখা
ক্ষণে ক্ষণে দিয়া দেখা
সকৌতুকে নিমেষে লুকায়,
কল্পনা তৃষিত হয়ে আপনার ক্ষুদ্র বুকে
সেই ছবি ফুটাইতে চায়।

প্রভাত রবির কোন লীলায়িত ভঙ্গিমায়
মেঘ মালা পড়ে লুটাইয়া,
স্নিগ্ধ অন্তরালে তার ধীরে বেলা বেড়ে যায়
আপনারে গোপন রাখিয়া।

চিত্র হয় দীর্ঘতর,
বেড়ে যায় পরিসর,
কামনার আয়ু বেড়ে যায়,
স্বপ্ন-মদিরার স্রোতে সুখ-শান্তি ভেসে যায়,
আশা শুধু আপনা জাগায়।

হায় তৃষাতুর হিয়া, তবু পরিতৃপ্তি নাই?
তবু নাই বাসনার শেষ?
ইন্দ্রায়ুধ-বিনিন্দিত বর্ণ-স্রোতে সর্ব্বদাই
জাগাইয়া সুরের আবেশ—
তবু তোর দীর্ণ প্রাণ
গাহে ব্যর্থতার গান?
স্বপ্ন-চিত্রে আনে বাস্তবতা?
কল্পনার যবনিকা সরাইয়া ধীরে ধীরে
দিকে দিকে ঢালে আকুলতা?

[১৩৩৪, ২৭শে আশ্বিন রচিত—১৩৩৫, "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত

স্বস্তি ।

সন্তানের রক্ত দিয়া রঞ্জিল যে জননীর বুক,
রমণীর দীপ্ত চোখে ঢালিল যে চির অন্ধকার,
নিমেষে করিল ম্লান শিশুদের ফুল্ল হাসিমুখ—
অধর্ম্মের বেশে দিল পরিচয় ধর্ম্ম-প্রাণতার।
অপবিত্র করিল যে দেবতার স্মৃতি-পূত ঘর,
রবি-করে যার করে উজলিয়া উঠিল কৃপাণ ;
করিতে শোণিত পান তৃষাতুর যাহার অন্তর,
নহে যে ব্যথিত কভু বিনাশিতে বিপন্নের প্রাণ।
ভুলিল যে আপনার শান্তিময় সুখময় গেহ,
স্বজনের রক্ষা হেতু করিল যে আত্মবলি দান,
ছুটিল মৃত্যুর পিছে পাশরিয়া জীবনের স্নেহ,
স্মরিয়া যাহার ছবি আকুলিত আত্মীয়ের প্রাণ।
আমারি সে সহোদর—সে আমারি মায়ের সন্তান,
দেবতার পায়ে আজ মাগি আমি তাহার কল্যাণ।

[১৩৩৩, ২রা আশ্বিন রচিত—১৩৩৩, "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

পাশাপাশি।

মিলন আনন্দ-উৎস—জগতের মঙ্গল-নিলয়,
মিলনেই শূন্যতার ক্ষয়।
জীবনের মহাযজ্ঞে মিলন যে দীপ্ত হোমানল,
মিলন-জলধি-গর্ভে লুপ্ত হয় স্বার্থ-হলাহল।
যত কিছু পবিত্রতা—যত কিছু স্নেহ-মধুরতা—
মিলনের পদতলে বিরাজিত সর্ব্ব আকুলতা,
শত শত কথা।
জগতে আনন্দ থাকে, থাকে যদি প্রীতির উৎসব,
মিলনেই তাহার গৌরব।

চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রতি অঙ্গ করিয়া বেষ্টন,
মহাশূন্যে করি' আকর্ষণ
মিলন জাগিয়া আছে তন্দ্রাহারা প্রহরীর প্রায়,
পূর্ণতা চরণে তার স্মিতমুখে আসিয়া দাঁড়ায়।
প্রকৃতি বিকাশ লভে হেরি' এই দৃশ্য সুমধুর,
নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে নিয়তির চিত্ত-অন্তঃপুর—
বিঘ্ন হয় দূর।
সর্ব্ব কাল সর্ব্ব যুগ দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে -আনন্দে,
গান গাহে নব নব ছন্দে।

কিন্তু এ মিলন আছে বিরহের অনুগত হয়ে
প্রাণে-প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে।
প্রেমের মোহন মন্ত্র মিলনের অঙ্গে ছাপাইয়া
বিরহের অন্তঃস্থল ঘিরিয়াছে আকুল হইয়া

বিরহ আপনাহারা দাঁড়াইয়া উদাসীন প্রায়
ধরণীর প্রতি রন্ধ্র ভরিয়াছে চির স্তব্ধতায়
আশা নিরাশায়।
স্নিগ্ধ সকরুণ সুরে বিনাশিয়া জগতের হাসি,
বাজিতেছে বিরহের বাঁশী।

মিলনে বিরহ-ভীতি, বিরহেই মিলনের আশা,
বিরহেই জাগে ভালবাসা।
বিরহের অশ্রুজল রচিয়াছে সমাধি সুন্দর,
সপ্ত বিস্ময়ের তাহা অন্যতম কীর্ত্তি অনশ্বর।
বিরহ-বিবশা সীতা জগতের পূজনীয়া অতি,
সাবিত্রী বিরহ-বলে ফিরাইল স্বামীর নিয়তি,—
শ্রেষ্ঠতমা সতী।
পবিত্র একান্ন পীঠ—পদাবলী বৈষ্ণব কবির—
বিরহের পূজার মন্দির।

কোন্ মহামন্ত্র বলে বিরহের সৌভাগ্য এমন,
বুঝি তাহা বুঝেছে মিলন
তাই সে ভুলিয়া তৃষ্ণা—হৃদয়ের কামনা ভুলিয়া,
বিরহের পদতলে যুক্ত করে আছে দাঁড়াইয়া।
লভিতে তৃপ্তির সুখ—জীবনের শান্তি—সার্থকতা-
মরমে মরমে তার স্পন্দমান শত ব্যাকুলতা,
জেগে ওঠে ব্যথা।
আলোকে উত্তাপ যথা—ছায়া যথা জীবনী কায়ার,
মিলনেই বিরহ-সম্ভার।

[১৩৩৪, ১লা চৈত্র রচিত—অপ্রকাশিত

ছায়া।

ফিরি আমি কল্পনার ঘরে
বাস্তবের চেতনা ভুলিয়া,
ছবি আঁকি কল্পনার পটে
অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া
জাগতিক সুখের বাসনা
বিসর্জ্জিয়া কল্পনা-অন্তরে,
হেরি মায়া—হেরি নির্ম্মায়তা
কল্পনার বিশ্বের সাগরে।

[১৩৩৪, ২৯শে ফাল্গুন রচিত—অপ্রকাশিত]

অন্বেষণ

দীন আমি, ক্ষুদ্র আমি, শব্দহারা মহাশূন্য আমি,
আমি অন্ধকার !
তুমি চির শোভাময়—তুমি এই জগতের স্বামী,
পবিত্র উদার।
তোমারি চরণ তলে সুখ-দুঃখ—অভিমান রাশি
ঢালিতেছে অশ্রু জল, ঢালিতেছে আনন্দের হাসি,
তোমার আশীষ-জ্যোতিঃ জগতের অন্ধকার নাশি'
করিতেছে আপনা প্রকাশ ;
মূঢ় আমি খুঁজিতেছি কোথা তব রূপের আভাস।
বিশ্বের কম্পনাতীত জগতের কোন্ পরপারে
আছ তুমি জ্যোতিঃ পারাবারে।

কবে প্রভু ধরণীর প্রসারিত হৃদয়-মুকুরে
তব প্রতিচ্ছায়া
আলোক-তরঙ্গ ঢালি—তমসায় রাখিয়া সুদূরে
উঠিল ফুটিয়া।
মানব বুঝিল তার জীবনের জীবনী কোথায়,
প্রকৃতি আনতমুখী সম্মুখে হেরিয়া দেবতায়,
জড়ের বিশাল বক্ষে—আঁধারের পাষাণ-কারায়
চেতনা লভিল সম্প্রসার ;
উল্লাস-লহর-স্রোতে নাচিয়া চলিল পারাবার।
জীবনের কোলাহল দিকে দিকে চলিল ছুটিয়া,
বসুন্ধরা উঠিল হাসিয়া।

কোন্ সে আদিম যুগে হে আমার জীবন-দেবতা,
প্রতিমা তোমার
নানা বর্ণে, নানাছন্দে দিয়েছিল অভয় বারতা
বক্ষে বসুধার।
তৃষার্ত্ত বুঝিল তার সম্মুখেই সুশীতল জল,
ক্ষুধার্ত্ত হেরিল ঊর্দ্ধে তরু শিরে বিলম্বিত ফল,
প্রকৃতির শ্যামতায় ফুটিল মাধুরী সুবিমল,
রূপ-মুগ্ধ চাহিয়া দেখিল ;
নির্ঝরের কল-তানে গীতরাশি ঝরিয়া পড়িল।
শোভা, প্রীতি, গানে, গন্ধে ধরণীর অমর প্রতিমা
স্বরূপ লভিল মহিমা।

তার পরে মানবের বিকশিত হৃদয়-কমলে
দাঁড়াইলে তুমি,
মহাশূন্য ধীরে ধীরে দাঁড়াইল পূর্ণ পদতলে
চারু জ্যোতিঃ চুমি !

উজ্জ্বল হইল ধরা, জ্যোতির্ম্ময় হইল আকাশ,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা প্রকাশিল তোমার আভাস,
দিকে দিকে হেরি তব লাবণ্যের অপূর্ব্ব বিকাশ,
নর নারী বিস্ময়-বিহ্বল ;
পূজিল তোমারে সবে যথাশক্তি অর্পিয়া সম্বল।
হাসিয়া প্রসন্ন মুখে সম্মুখে দাঁড়ালে প্রিয়তম,
শিখাইয়া পূজা-প্রকরণ।

সেই হতে দেব তুমি মানবের হৃদয়-মন্দিরে
চির অধিষ্ঠিত,
তোমার স্নেহের ধারা সেই হতে আজো ধরণীরে
করিছে প্লাবিত।
করুণা-আলোকে তব পরিপূর্ণ প্রকৃতি এখন,
তোমারি আনন্দ-স্রোতে ভাসিতেছে জীব অগণন,
শুধু প্রভু এক কোণে পড়ে আছি আমি অভাজন,
রিক্ত, শূন্য, তৃষিত, তাপিত,
অন্তহীন বেদনার আলোড়নে হইয়া ব্যথিত।
খুঁজিতেছি ধারণার বেলাভূমে দাঁড়াইয়া একা
কোথা প্রিয়, তব পদ-রেখা।

[১৩৩৩, ১৭ই ভাদ্র রচিত—১৩৩৩, "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

আশ্বাস।

সুখের আশা ফুরায় যদি কিসের ব্যথা তবে ?
দুঃখের স্নেহ-শীতল দিঠি সে ত সঙ্গে র'বে !
হৃদয়-নদী কূলে কূলে
ছাপিয়ে যখন উঠ্‌বে ফুলে,
আশার ঊর্ম্মি অচিন্ দেশে হর্ষে ছুটে যাবে,—
হারিয়ে পথ, ঊষর দেশে
লুটিয়ে পড়্‌বে যখন এসে,
তখন দুঃখ আদর ক'রে কোলে তুলে লবে।
নীড় হারাবার ভয় নাই,
দুঃখ আছে সঙ্গে ভাই,
শান্তি যদি পেতে চাও বরণ কর তবে।

[১৩৩২, ৬ই চৈত্র রচিত—অপ্রকাশিত]

প্রতিষ্ঠা।

তোমায় আমি রাখ্‌ব লুকিয়ে মনের গোপন ঘরে
বাস্‌ব ভাল জীবন ঢেলে দিয়ে,
অনুরতির শোভন কমল ফুট্‌লে হৃদয়-সরে,
রাখ্‌ব তোমায় তারি উপর নিয়ে।

নিত্য পূজা কর্‌ব তোমায় জীবন-ঢালা প্রেমে,
দুঃখ-ব্যথার অযুত উপচারে,
সকল সময় থাক্‌ব ডুবে তোমার মধুর নামে
পুষ্প-কোমল স্মরণের ঘরে।

অতীত যখন নেবে আমায় বুকের মাঝে টেনে
আদর ক'রে বাড়িয়ে দুটি হাত,
ভবিষ্যত চাইবে না আর তখন আমার পানে,
করবে নাক স্নেহ-অশ্রুপাত।

একলা একলা স্মৃতির ঘরে ব'সে আপন মনে
তখন তোমায় কর্‌ব আকর্ষণ,
জীবন-রাজ! আমায় যদি বারেক আঁকো প্রাণে,
—হবে আমার ব্রত উদ্‌যাপন।

১৩৩২, ১লা বৈশাখ রচিত- ১৩৩৫ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত

প্রার্থিত।

বাসনার তৃপ্তি হোক্—একথা বলি না আমি,
চাহিনাক পূরাতে কামনা,
আমি চাই যুগে যুগে তোমারে ডাকিতে স্বামী,
প্রাণ ঢেলে করিতে সাধনা।

চির প্রবাহিত রবে আমার অন্তর মাঝে
ভালবাসা—স্বরগের নদী,
নিভৃত মরম তলে শুধু এই সাধ আছে,
স্নেহ ভরে পূর্ণ কর যদি !

সহস্র বাসনা আশা হৃদয়ের স্তরে স্তরে
জেগে ওঠে প্রতি পলে পলে,
সীমাহারা অভিলাষ শত যুগ-যুগান্তরে
প্রাণে শুধু মহাতৃষা ঢালে !

সকলি পূরিয়া যাক্—কভু আমি এ মিনতি
করিব না চরণে তোমার,
যাচি শুধু করযোড়ে ওগো জগতের পতি !
মতি থাক্ তোমাতে আমার

[১৩২৮, ১৮ই অগ্রহায়ণ রচিত—১৩[illegible]১, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আত্মহারা।

আমি যে তোমারে ডাকি প্রিয়তম,
সে শুধু আমারি তরে,
বিশাল জগতে কিছু নাই মম
হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।
জীবনের সার জেনেছি তোমায়,
জানিনা কল্পনা ব'লে,
লুটাতে চরণে বড় সাধ যায়
ভাসিয়া নয়ন জলে।
আমার প্রাণের নীরব সাধনা
তুমিই বুঝিবে প্রভু,
এ জীবনে যত কামনা, বাসনা,
সকলি তোমার বিভু।
হাসি, অশ্রুজল হৃদয়ের কোণে
যখন আঘাত করে,
ধারনা শকতি তোমার চরণে
তখনি লুটিয়া পড়ে।
সকল ভুলিয়া তোমারে ভাবিতে
আজ বড় সাধ যায়,
চির প্রত্যাশিত! নিকটে আসিতে
কেন এত দেরী হয়?
মরীচিকা নয় ধরণী আমার,
জীবন স্বপন নয়,
যেখানে যা দেখি আভাসে তোমার,
তুমি যে গো বিশ্বময়।

[১৩২৮, ২৭শে কার্ত্তিক রচিত—১৩৩৩ "জন্মভূমিতে" প্রকাশিত]

মলিনা।

রাঙ্গা মেঘ হাসে যবে সোনালী আভায়,
তখন আমার প্রিয় হাসি মুখে চায়।
আমি কেন মনোদুখে
বসে র'ব ম্লানমুখে !—
নিজে হেসে প্রিয় মোর অপরে হাসায়,
আমারি আনন ঢাকা ঘন তমসায় !

যখন আঁধার নামে শ্যাম বন-ছায়,
হাসিয়া তখন প্রিয় তার দিকে চায়।
সে নীরব হাসিরাশি
বসুধার বুকে আসি
আনন্দ-পরশে তার পরাণ মাতায়,
আমিই মলিন মুখে চেয়ে থাকি হায় !

বাগানে ফুটিলে ফুল ললিত ছটায়,
মধুর হাসিয়া প্রিয় সেই দিকে চায়।
তার সে হাসির আভা
বাড়ায় ফুলের শোভা,
উল্লাসে প্রকৃতি রাণী আপনা হারায়,
আমার মলিন মুখ কোথা ডুবে যায় !

হাসিয়া উঠিলে শশী পূরব আশায়,
হাসিভরা মুখে প্রিয় তার পানে চায়।
চাঁদের হাসির মাঝে
প্রিয়ের হাসিটি রাজে,
মণির সৌন্দর্য্য যথা কনক আভায়—
ম্লান মুখে দেখি আমি দিশাহারা প্রায়!

রাঙ্গা রবি হাসে যবে শান্ত নীলিমায়,
তখনো হাসিয়া প্রিয় ধরারে হাসায়।
সেই স্নেহ-বিকশিত
হাসিটুকু সুললিত,
ধরণী ভরিয়া তোলে স্নেহ-মমতায়,
আমারি হৃদয় শুধু আবিলতাময়!

প্রীতি ভরে দাতা দান করে গ্রহীতায়,
হাসিয়া আমার প্রিয় তার দিকে চায়।
সুখীর মরম তলে
প্রিয়ের হাসিটি ঝলে,
জাগে প্রিয় দরিদ্রের শান্ত ধীরতায়,
অমানিশা ভাসে শুধু আমার হিয়ায়!

জাগিলে বসন্ত ঋতু তরু লতিকায়,
আদরে আমার প্রিয় হাসিমুখে চায়।
রুচিরা প্রকৃতি রাণী
সে হাসির ছবিখানি
যতনে হৃদয়ে ধরি ধরারে সাজায়,
আবরিত হিয়া মম ঘন কালিমায়!

মেঘে ঢাকা নীলাকাশ স্নিগ্ধ বরষায়,
হসিত আননে প্রিয় সেইদিকে চায়।
শ্যাম শোভা চারিদিকে
উছলিয়া পড়ে সুখে,
বিবশা শিখর বালা রূপ-মদিরায়;
ব্যর্থ আকুলতা জাগে আমার হিয়ায়!

অমৃত-শোভায় ধরা সবারে মাতায়,
দূরে পড়ে আছি আমি বিষ-লতা প্রায়।
আসিলে আমার কাছে,
যার যা সৌন্দর্য্য আছে
আপনা আপনি যেন শুকাইয়া যায়,—
আমার হৃদয় শুধু সবারে পোড়ায়!

জাগ নাথ! একবার আমার হিয়ায়,
বিদূরিত কর প্রভু পাপ-তমসায়।
ভরিয়া উঠেছে ধরা,
তোমারি ও হাসিভরা
আননের স্নেহমাখা শীতল ছায়ায়,
আমি কেন ঢেকে র'ব আবিলতা-ছায়?

[১৩২৮, ২রা বৈশাখ রচিত—অপ্রকাশিত]

আমার।

ক্ষুদ্র বালুকণা আর সৌর জগতের
সৃষ্টি কর্ত্তা তুমি মূলাধার,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডখানি তোমারি চরণ
প্রদক্ষিণ করে বার বার।

ফুল ঝরে, পাতা খসে, নদী বয়ে যায়,
হেরি তথা তোমারি স্পন্দন,
অবিচল শিখরের মরমে মরমে
চেতনা জাগাও অনুক্ষণ!

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে সাজানো কেমন,
ভাবিতে বিস্ময় লাগে মম,
কেমনে করিলে আত্ম-প্রকাশ জগতে,
হে আমার চির প্রিয়তম!

কিছু অনুভূতি নাই, কিছুই বুঝি না,
সৃষ্টিতত্ত্ব হয় নাই শেখা,
বিশ্বের দেবতা নও, হে মঙ্গলময়!
তুমি মাত্র আমারই একা!

এত বড় জগতের রচয়িতা তুমি,
সেই তুমি আমার দেবতা,—
সকল সময়ে আমি এই কথাটিরে
ভাবিতেও মনে পাই ব্যথা।

আর কিছু নাই প্রভো, তুমিই আমার,
চিরকাল তোমারই আমি,
তোমারি চরণ-পদ্ম হৃদয়-মৃণালে
যুগে যুগে ফুটাইব স্বামী।

[১৩[illegible], ৫ই আশ্বিন রচিত—১৩২৯, "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত]

বাঞ্ছিত।

জীবন-কুসুমে মম কর আজি শান্তি-সুরভিত,
কর দেব, চির পবিত্রিত।
তোমারি স্নেহের মধু জাগে যেন বাসনা-পরাগে,
রক্তিমা ফুটিয়া ওঠে যেন তব প্রীতি-অনুরাগে;
আনন্দ-মাধুরী যেন অন্তরের অন্তরে ফুটিয়া
পুন্যময় পরিমলে গন্ধবহে রাখে উচ্ছ্বসিয়া
আপনা ভুলিয়া।
মুকুলিত দলগুলি ধীরে ধীরে লভিয়া বিকাশ,
ঢালে যেন সুষমা-আভাস।

যদিও বনের ফুল—নাই তবু বেদনা আমার,
নাই কিছু দুঃখ কামনার।
অধিকার ছিল মম, তাই আজ উঠেছি ফুটিয়া,
অধিকার আছে প্রিয়, পদতলে পড়িব লুটিয়া।
বিজন কানন কোলে আবরিয়া ঘন পত্রচ্ছায়
আপনারে লুকাইয়া ফুটিয়াছি তোমারি কৃপায়,
—আপন আ[illegible]ায়।
দশদিক্ উদ্ভাসিয়া হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-আভায়,
আশীর্ব্বাদ ধরিব মাথায়।

কল্পনার স্বপ্নালোকে চলিবার পথ হারাইয়া,
বেলাশেষে হতাশ হইয়া,
স্বপ্নহারা কেহ যদি এতটুকু তৃপ্তির আশায়
আমাই ছিঁড়িয়া লয় দাঁড়াইয়া কানন-ছায়ায়,
হৃদয়-সৌরভ মম ক্ষণ তরে উঠি নিশ্বসিয়া
তারে যেন সুখী করে আপনার বেদনা ভুলিয়া
—প্রশান্তি ঢালিয়া।
জীবন মরণ হয়ে আনন্দের অমিয়-পরশে
জাগে যেন বিপুল হরষে।

[১৩৩৫, ১২ই ভাদ্র রচিত—অপ্রকাশিত]

জীবন-দেবতা

আরক্ত উষায় দেখেছি তোমায় গগনের নীলিমায়,
দেখেছি তোমারে হিরণ-সন্ধ্যায় প্রকৃতির চারুতায়।
উজ্জ্বল দিবসে দেখাইলে তুমি ধরণীর ধূসরিমা,
নৈশ-নীরবতা ধরিল হৃদয়ে তব স্নেহ-মধুরিমা।
কুসুম লভিল সফল বিকাশ তোমারি প্রীতির ভায়,
তোমার স্নেহের পরশ জাগিছে দূর বনান্তের ছায়।
প্রকৃতির বুকে—মানবের ঘরে—সপ্ত ভুবনের কোলে—
ওগো প্রিয়তম, দেখিয়াছি আমি তোমারি প্রদীপ জ্বলে।
আকাশে বাতাসে উঠিছে ভাসিয়া মধুর আভাস তব,
সাগরে নির্ঝরে জাগিছে তোমার স্নেহধারা অভিনব।
জীবন-দেবতা, পেয়েছি তোমারে জীবনের প্রতি কাজে,
প্রতি নিমেষের অন্তরালে নাথ, তোমারি প্রতিমা রাজে।
জানিতে এখন আকুল বাসনা, জীবনের অবশেষে—
চির প্রিয়তম, নিকটে আমার দাঁড়াইবে কোন্ বেশে!

[১৩৩৫, ১৪ই ভাদ্র রচিত—১৩৩[illegible], "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

প্রহেলী

শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য ! পারাপার প্রকাশিত নয়,
অস্ফুট—আঁধার
তবু চির জ্যোতির্ম্ময়—তবু চির প্রতিবিম্বময়
সৌন্দর্য্যের সার।
বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীতের স্বতন্ত্রতা নাই,
চিত্রময় ছায়া তার শূন্য-পটে বিম্বিত সদাই ;
নাই কিছু ব্যবধান—কোন কিছু অন্তরাল নাই,
সম্পূর্ণতা লভিছে প্রসার,
মহাশূন্যে হাসে ঊষা—শান্তি জাগে গভীর নিশার।
বিশ্বের রহস্য-লীলা শূন্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া
চলিয়াছে তরঙ্গ তুলিয়া।

কোথা রবি-শশী-গ্রহ, তারকিত নীহারিকাময়ী
সরণী কোথায় !
কিবা আছে ধরিবার ? কোন্ স্মৃতি হতে পারে জয়ী
মহাশূন্যতায় ?
আবহ আপনাহারা প্রতিচ্ছায়া-সাগরের বুকে,
সীমাহারা দশ দিক লুকায়েছে পরম কৌতুকে,
নিয়তি একেলা শুধু দাঁড়াইয়া বিহসিত মুখে
হেরিতেছে—ছায়াবাজিময়
মহাশূন্যতার বক্ষে জাগে কিবা মহা অভিনয় !
দ্বিতীয় ভুবন-বক্ষে প্রাণের জাগে শিহরণ,
সপ্তলোকে ভ্রমিছে স্পন্দন।

—এই নাই ! ঊর্ম্মিকায় ঊর্ম্মিমালা হাসে,
হাসিছে ঊর্ম্মিলা ;
কোথা গান,—কোথা হাসি ? শূন্যতায় বিম্বরাশি ভাসে,
তরঙ্গের লীলা !
কোথা বিম্ব ? কিছু নাই,—প্রকৃতির চিত্র সুমধুর ;
নিয়তির লাস্যলীলা উচ্ছ্বসিয়া চতুর্দ্দশ পুর
স্পন্দনের প্রতি তালে জাগাইয়া কামনার সুর
আঁকিয়াছে আলেখ্য কেমন !
নিমেষ চলিয়া যায়—বক্ষে তার পড়ে ঝাঁপাইয়া
বাসনার অনন্ত জীবন ।

অন্তহীন মহাশূন্য পূর্ণতার পরশ লভিয়া
কাঁপে বার বার,
অশান্ত প্রবাহ রাশি অলক্ষ্যের আবেশে ডুবিয়া
তুলিছে ঝঙ্কার ।
গতিশীল কাল-চক্র ঘূর্ণাবর্ত্ত করিয়া সৃজন
প্রকাশের—বিনাশের রেখা-চিত্র করিছে অঙ্কন ;
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে শূন্য পট লভিয়া জীবন
প্রবেশিল জ্ঞানাতীত পুরে—
কল্পনা ! কোথায় যাও ? হের ওই চির জ্যোতির্ম্ময়ী
যবনিকা পড়িল অদূরে ।

[১৩৩৫, ২রা আশ্বিন রচিত—১৩৩৫, "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

অনির্দ্দেশ।

রূপ-ভূমি বহু শত স্বপ্ন বিরচিয়া
আমারে ভুলাতে চায় [illegible]ার মায়ায়,
সহসা অরূপ বিশ্ব আত্ম প্রকাশিয়া
দশদিক্ দীপ্ত করে তৃপ্তির আভায়
জড়িমা-আবেশ আর চৈতন্য-আভায়
ধরারে ঘিরিয়া রাখে স্নেহ-আবেষ্টনে,
নিমেষে নিমেষে করে আপনা প্রকাশ,
আবার আবদ্ধ হয় আপন বন্ধনে।
আকর্ষণ-বিকর্ষণ! হায় নারায়ণ,
এখনো কি রবে তুমি সলিল-শয়নে?
এই তরঙ্গের স্রোতে ঢালিয়া জীবন
আমি কি মিশিয়া যাব তোমার চরণে?
জল-বিম্ব লভে যদি জলধি-সাক্ষাৎ—
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তবে কেন বিশ্বনাথ!

[১৩৩৫ ২রা কার্ত্তিক রচিত—১৩৩৫, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

বিহ্বল।

জান [illegible] দিবা নিশি এ হৃদয়
তোমারি চরণ তলে পড়ে লুটাইয়া,
আনন্দের আশা, হাসি, বেদনার অশ্রুরাশি
নিয়ত বিকাশ লভে তোমারে চাহিয়া ;
তোমারি—তোমারি প্রীতি জীবনের পুণ্য-স্মৃতি,
অন্তরের সত্যালোক-সৃজিত সুন্দর,—
মধুর তোমারি নাম, তুমি চির প্রাণারাম,
জীবনে মরণে তুমি প্রিয় সহচর।
উৎসর্গ করিয়া প্রাণ চাহি নাই প্রতিদান,
ভবিষ্যের তরে কিছু করিনি সঞ্চয়,
আপনারে পাসরিয়া হৃদয় ঢালিয়া দিয়া
তোমারি চরণ শুধু করেছি আশ্রয়।
সাগরে সরিত যথা,— আমার কামনা তথা
তোমারে বেড়িয়া রহে আপনা পাসরি,
তবু কেন, কেন নাথ ! দিয়া দুঃখ অভিঘাত ,
আমারে করিতে চাহ একান্ত তোমারি ?

[১৩৩৫, ১৮ই কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত]

অশক্ত।

কল্পনা বিবশা আজি, নৈশ-সমীরণ
বহে মৃদু মৃদু, কাঁপে হৃদয় ধরার ;
শুক্লা চতুর্থীর শশী হাসে ক্ষীণ হাসি,
ভেসে যায় ক্ষীণতর আলোকের রেখা।
নিশীথ-বিহঙ্গ-রুত গভীর নিশায়
একেলা বসিয়া আছি গৃহ বাতায়নে,
বহু শত অনুভূতি প্রসুপ্ত এখন,
কেবল জাগিয়া আছে কল্পনা আমার।
অঞ্জন-সন্নিভ অদ্রি দূরে দাঁড়াইয়া—
পিছনে জলদ তার, ঊর্দ্ধে শশধর।
সম্মুখে পড়িয়া আছে বিশাল প্রান্তর,
সুদূরে সুবর্ণ-রেখা চলেছে বহিয়া।
তরুশিরে পরিব্যাপ্ত নৈশ-অন্ধকার,
মধুর মর্ম্মর-রবে পূরে দশ দিক্ ;
ঝিল্লী-কণ্ঠে ভেসে ওঠে মঞ্জুল রাগিণী,
নিশীথ-প্রসূন ঢালে সুরভি সুন্দর।
কল্পনা চাহিয়া আছে অতৃপ্ত হৃদয়ে,
প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য-সিক্ত অনুভূতি তার ;
কোন্ চিত্র চিত্ত-পটে লইবে তুলিয়া,
ভাবিয়া না পায়—চাহে প্রলুব্ধ নয়নে।

[১৩৩৫, ৩০ শে কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত]

অজ্ঞেয়

কো[illegible] স্বপ্নের ছবি, জাগরণ কত দূরে নাথ !
অস্তিত্ব বিস্তার কোথা, লয়-ভূমি কোথা লীলাধার ?
এই যে সহিয়া যাই বহু শত স্মৃতি-অভিঘাত—
কিবা এর পরপারে ? সার্থকতা কোথায় আমার ?
মাস বর্ষ মিশে যায় অন্তহীন কালের পাথারে,
বক্ষে তার লুপ্ত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশার স্বপন ;
কেহ বলে,—"ছায়া ভাসে কল্পে কল্পে জীবের অন্তরে,"
কেহ বলে,—"কিছু নাই, কামনার নাহি জাগরণ ।"
আমি শুধু চেয়ে থাকি—আঁখি দুটি নিমেষ হারায়,
হৃদয় ভুলিয়া যায় পলে পলে স্মৃতি-অনুভূতি ;
ধরণী নয়নে ভাসে কল্পনার চিত্র-লেখা প্রায়—
জীবন হেরিতে চায় আপনার শেষ পরিণতি ।
বাসনার সুষমায়—চৈতন্য পূরিত পূর্ণতায়—
আমিত্বের সার্থকতা বল নাথ ! হেরিব কোথায় ?

[১৩৩৬, ১১ই জ্যৈষ্ঠ রচিত—অপ্রকাশিত]

অমৃত।

রূপাতীত! জানি তুমি সৌন্দর্য্যের
বিশ্ব তব রূপের বিকাশ;
জ্ঞানাতীত! জানি তুমি জ্ঞা
মঙ্গলের অপূর্ব্ব আভাস!
কখনো প্রকৃতি-রূপে দাঁড়াও সম্মুখে
ওগো দেবি! বন্দিতা আ
ধরিত্রী হাসিয়া ওঠে পরম কৌতুকে
হেরি তব সুষমা-সম্ভার।
কখনো পুরুষ বেশে আছ দাঁড়াই
জ্ঞানময়, মঙ্গল-স্বরূপ!
অরূপ-আভায় তব উঠে বিভা
ধরণীর প্রতি লোম-কূপ।
কভু হেরি শোভা পায় ত্রিজগতী তলে
জ্যোতির্ম্ময় অর্দ্ধ-নারীশ্বর,
চিন্ময়ী হ্লাদিনী শক্তি সবিতৃ-মণ্ডলে
বিশ্বভূত-জীবনী সুন্দর।
নিশ্বাসে সৃজিলে বেদ, ইচ্ছায় রজনী,
মহাব্যোমে প্রাণের স্পন্দন,—
পঞ্চেন্দ্রিয়ে, পঞ্চপ্রাণে সত্য স্বরূপিনী,
সূক্ষ্ম-ভূতে স্থূলতা-মিলন।
জীবনের জনয়িতা! সন্তান তোমার
করিতেছে প্রণাম তোমায়,
হে প্রিয়, হৃদয়-সখা! হের আর বার,
পিয়া তব

বিশ্বের বিধাত্রী তুমি জননী আমারি—
কন্যা তুমি স্নেহের প্রতিমা,
্গ যুগে কল্পে কল্পে অন্তরে তোমারি
ই বিকাশিত আনন্দ মহিমা।
কে আমি, কে তুমি বন্ধু! কি কথা বলিয়া,
কারে দিব কার পরিচয়?
কোথা রূপ—কোথা জ্ঞান? জগত ভরিয়া
হেরি শুধু আনন্দ অক্ষয়।

[১৩৩৬, ৩রা আষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত]

আকর্ষিত

তোমার নির্ণীত এই অদৃষ্ট-বিধান—
এ যেন হৃদয়-ভেদী অমৃত-প্রলেপ!
ভেঙ্গে যায় প্রাণ! পলে পলে চূর্ণ হয়
দীর্ণ মর্ম্মস্থল; মনোবীনা ঝঙ্কারিয়া
নিয়ত বাজিয়া উঠে বিষাদ-রাগিনী।
অশ্রুজালে অবরুদ্ধ আঁখি; ভেসে আসে
শ্রুতিমূলে প্রলয়ের নিনাদ গভীর!
অবলুপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-ইন্দ্রজাল!
যে পথে এমন দুঃখ, এত অভিতাপ—
জানি না কিসের আশে—কোন্ আকর্ষণে,
সে পথের অভিমুখে চির দিবা নিশি
ছুটে যায় আত্মহারা কামনা আমার?

ফিরাইতে চাহি আমি, প্রতিহত আশা
কাঁদিয়া ফিরিয়া আসে হৃদয়ের দ্বারে।
প্রিয় তুমি, প্রিয়তর—প্রিয়তম তুমি,
সত্তার গৌরব তুমি—বিশ্ব প্রকৃতির;
আমারি জীবন তুমি, নিখিলের প্রাণ-
তোমার বিধান তাই মধুর এমন ?

১৩৩৬, ১২ই অগ্রহায়ণ রচিত—অপ্রকাশিত]

আকৃষ্ট

যুগে যুগে যে শৃঙ্খলে প্রিয় আমি বেঁধেছি তোমায়,
শক্তি যার লুপ্ত নয় কামনার সীমান্ত-রেখায় ;—
সে শৃঙ্খল অয়স নির্ম্মিত ?
অথবা সে কিঙ্কণ্‌ক-ভূষিত ?
আমি ত' জানি না প্রভু ! লভি নি ত' পরিচয় তার !—
জানি শুধু সর্ব্ব কর্ম্মে সেই শক্তি সহায় আমার।

ইহলোকে—পরলোকে মিলনের সেতু বিরচিয়া
জড়-চেতনের বক্ষে দিয়াছে সে আনন্দ ঢালিয়া।
সুর বেঁধে জীবন-বীনায়
সেই শক্তি সামগান গায়,
তাহারি পরশ পেয়ে ধরণীর মহা আকর্ষণ
কল্প-লীলাময় কাব্য, কল্পনার অমর জীবন।

…দন চিত্র, ভবিষ্যের মধুর স্বপন,
…স্মিত বাসনা-জ্যোতিঃ কামনার রত্ন-সিংহাসন,
আকাঙ্ক্ষার সহস্র মিনতি,
হৃদয়ের প্রীতি …রতি,
মধুম… স্পর্শে তার নিজ সত্তা রাখে জাগাইয়া,—
নিয়তি কালের বুকে স্বপ্ন রচে তাহারে হেরিয়া !

হে দেবতা বিশ্ব-প্রিয় ! জীবনের আনন্দ সম্ভার !
তোমারি পূজার তরে এই শক্তি কুসুম আমার ;
ঢেলে দিয়ে হৃদয়ের জ্বালা
কভু গাঁথি কামনার মালা,
কখনো ভুলিয়া ধরা, পাসরিয়া সাজানো সংসার,
"তুষ্ট হও প্রিয়তম" যুক্ত করে বলি বার বার।

এই আমিত্বের স্মৃতি—এ আমার সাধের শৃঙ্খল ;
চির মঙ্গলের স্রোতে এই স্মৃতি তুলেছে হিল্লোল ;
সুখ-দুঃখ তরঙ্গ তুলিয়া
কাল-নদী চলেছে বহিয়া,
কূলে বসি অন্তরাত্মা দিবানিশি করে হাহাকার,
আমিত্ব-শৃঙ্খল তথা তুলিয়াছে আকুল ঝঙ্কার।

দূরে র'বে প্রিয়তম ! র'বে তুমি চির অপ্রকাশ ?
আমার আমিত্ব প্রভু, জাগাইবে তোমারি আভাস !
তুমি মম হৃদয়রঞ্জন,
বিশ্বরূপ তুমি নারায়ণ,
জীবনে মরণে তুমি অনির্ণীত আনন্দ আমার,
আমি আছি,—ভাষাতীত ! তাই তুমি সাধনার সার

[১৩৩৬, ২০শে অগ্রহায়ণ রচিত—অপ্রকাশিত]

শেষ সাধ।

অন্তর-শোণিমা ঢালি পৃথিবীর বুকে
অস্তমান রবিসম—আমার জীবন
যে দিন বিদায় লবে বসুন্ধরা হতে,
স্নেহ-প্রীতি-প্রেমভরা আঁখি দুটি তুমি
সে দিন আমার পানে বারেকের তরে
চেয়ে দেখো চিরপ্রিয় ; সকরুণ দুটি
নয়ন-পল্লবে মম, তব আঁখি-তারা
নিমেষের তরে যেন হয়ে থাকে স্থির।
তার পরে আমি—চির পরিপূর্ণ বুকে,
পরিতৃপ্ত সুখ-ভরে লইলে বিদায়,
স্মৃতির ফলকে এঁকে সেই ছবিখানি
তুমি ফেলে চলে যেয়ে আপনার কাজে।

[১৩৩০, ২০শে কার্ত্তিক রচিত—১৩৩২ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

উচ্ছ্বাস।

সাধ হয়, ছেড়ে দিয়ে কর্ম্ম-কোলাহল,
ছেড়ে দিয়ে তুচ্ছতম আশা, অভিলাষ,
ভাষাতীত—জ্ঞানাতীত—স্মৃতি-বহিভূ্ত,
চলে যাই কোন এক অজানিত দেশে।
কেহ না রহিবে তথা ; শুধু তুমি প্রিয়,
প্রীতি-বিকশিত মুখে রবে দাঁড়াইয়া ;
অনুরতি-অবশেষে—তৃপ্তি-পরপারে
আছে যাহা, তাই দিয়া পূজিব তোমারে।

এ জীবনে মিটে নাই দেখিবার সাধ,
তাই সখা ইচ্ছা হয় আপনা ভুলিয়া,
পাসরিয়া জগতের স্বপন-কল্পনা—
ই অনিমেষে চেয়ে দেখি আনন তোমার।
এই শরীরের মাঝে আছি যত দিন—
ততদিন প্রিয় আমি পাবনা তোমায়,
আমারি পীড়ার ক্লেশ হিয়া হতে মম
তোমারে টানিয়া লয় দূরে—দূরান্তরে।
দিবানিশি দুঃখ পাই, অভাগিনী আমি,
সেই সাথে দহিতেছি হৃদয় তোমার ;
করি নাই সেবা যত্ন, শুধু পলে পলে
করিতেছি সংসারের কল্যাণ-বিনাশ।
আমি যে তোমারি প্রিয়া—তাই প্রিয়তম,
পারি না আপন হাতে জীবন নাশিতে ;
আমার অভাবে তুমি হবে আশাহীন—
(কবির কল্পনা নয়, সত্য এ ভারতী।)
আছে জায়া—আছে গৃহ, আছে পরিজন,
তথাপি সংসারে আমি আনন্দ তোমার ;
তাই সাধ হয় নাথ, ধরণী ভুলিয়া
চলে যাই অতি দূরে—অতীন্দ্রিয় পুরে।
বাসনার কোলাহল, শরীরের ক্লেশ,
সব কিছু পাসরিয়া—আপনা ভুলিয়া,
জগতের আকর্ষণ জগতে রাখিয়া
করিব তথায় বসি সাধনা তোমার।
কর্ম্ম-অবশেষে যবে প্রেম-আকর্ষণে
আসিয়া দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে আমার,
তখন চরণ তলে পড়িব লুটিয়া,
পাসরিব হৃদয়ের যত কিছু ভার।

অপলক আঁখি তুলি দেখিব চাহিয়া

অনন্ত আনন্দময় আনন তোমার,

তথায় রবে না গৃহ—রবে না কর্ত্তব্য,

শুধু তুমি আমি [illegible]

[১৩৩৩, ১লা ফাল্গুন রচিত—অপ্রকাশিত]

লক্ষ্যহারা।

পীড়িত দলিত আমি, আমার আনন পানে

ফিরিয়া চাহে না কেহ তাই,

একটি স্নেহের বাণী, একটু প্রাণের প্রীতি,

জগতে আমার তরে নাই।

আমি শুধু শূন্য মনে [illegible] বিরলে বসিয়া র'ব,

একেলা জীবন কেটে যাবে,

আমার নয়ন-ধারা, নীরবে পড়িয়া ঝরি

বসুধার বুকে মিশে র'বে।

বিফল অতীত-স্মৃতি, আঁধার ভবিষ্য-ছবি

ব্যর্থতায় ভরা বর্ত্তমান;

কোন্ সুখে বেঁচে র'ব, কি কাজে কাটাব দিন,

ভাবি শুধু নিশি দিনমান।

বিশ্ব-প্রকাশক প্রিয়, কত দূরে আছ তুমি—

কোথা তব দৃষ্টি স্নেহ-ভরা?

কোন্ সাধনার ফলে তোমারে পাইব আমি,

বল নাথ! বল করি ত্বরা।

[১৩২৯; ২রা জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৬, "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আলেখ্য

চাহিনা হেরিতে আমি স্বপ্ন-মরীচিকা-ছায়া,

আকাঙ্ক্ষার আলো-অন্ধকার,—

ধারণা জাগিয়া থাক্, থাক তুমি প্রিয়তম

অন্তরের অন্তরে আমার।

অবসিত ব্যাকুলতা, অবসিত অভিতাপ,

অবসিত অতৃপ্তি-আবেশ,—

শুধু তুমি, আমি নাথ !—সারাটি ধরণী জুড়ি,

প্রেম শুধু রবে অবশেষ।

হৃদয়ে স্পন্দন নাই, শ্রবণ শোনেনা বাণী,

আঁখি-তারা করে না দর্শন,

বিলুপ্ত হিমাংশু-রবি, অবলুপ্ত চরাচর,

ত্রিভুবন সমাধি-মগন !

কেবল হৃদয়-পটে কল্পনা-তুলিকা-মুখে

চিত্র তব উঠিবে ফুটিয়া,

অন্তরের অন্তরালে চির বসন্তের শোভা

নিশিদিন রহিবে জাগিয়া।

জগতের অনুভূতি, জীবনের দুঃখ-ক্লেশ,

হৃদয়ের নীচতা, ক্ষুদ্রতা,

অতীত-জলধি-তলে চির বিমজ্জিত হবে

প্রেম শুধু লভিবে পূর্ণতা।

জাগিবে তাহার সাথে আনন্দের মধুরতা,

জীবনের অনন্ত আলোক,—

শান্তির পবিত্র জ্যোতিঃ উদ্ভাসিবে দশ দিক,

—অন্তরাত্মা হইবে সার্থক।

[১৩৩৬, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রচিত—অপ্রকাশিত]

অতীতের স্মৃতি।

মায়ের কুমার দুটি [illegible] মোসলেম,
উভয়েই জননীর নয়নের তারা ;
আজি দোঁহে পাসরিয়া স্নেহ, প্রীতি, প্রেম,
বহাইল মাতৃ-চক্ষে তপ্ত অশ্রুধারা।
মনে পড়ে "কুরুক্ষেত্রে" "হিরণ্বতী" তীরে
এক দিন শোণিতের তটিনী বহিল ;
শোকার্ত্তের দীর্ঘশ্বাস মিশিল নমীরে,
রমণীর হাহাকারে গগন পূরিল।
"ফোরাত" নদীর কূলে আর একদিন
বহিল রুধিরধারা "কারবালা" বুকে,
বিপন্নের আর্ত্তনাদে বিশ্ব বিমলিন—
কাঁদিল ভয়ার্ত্তা নারী অশ্রু-ম্লান মুখে।
আজি এই রক্ত-স্রোত হেরিয়া নয়নে
বর্ত্তমান মিশে গেল অতীতের সনে।

[১৩৩২, ২৮শে চৈত্র রচিত—অপ্রকাশিত]

স্মরণীয়া।

হের আজি অতীতের ছবি,
ওই দেখ নীলাকাশে [illegible] প্রভাতের রবি
তৃণ-ব্যবধান রাখি বসিয়াছে অযোধ্যার
রাবণ মাগিছে প্রেম সকাতরে যুড়ি দুই পাণি।
সম্মুখে গরজে সিন্ধু—বক্ষে তার তপনের ভাতি
ঊর্ম্মি-লহরীর বুকে ফুটায়েছে অমরার জ্যোতিঃ।
সহসা কাঁপিল সতী, দীপ্ত চোখে ফুটিল অনল,
আরক্ত আনন রোষে—দেহলতা হইল চঞ্চল।
হেরিয়া সে দৃপ্ত ছবি রক্ষঃরাজ পশ্চাতে সরিল,—
পঙ্কিল হৃদয়ে তার ভক্তি-রেখা ফুটিয়া উঠিল।
ত্রিদিব বিজয়ী বীর ফিরে গেল গৃহে আপনার,
ভারতের নারী ইনি—বঙ্গবালা! কর নমস্কার।

হের অন্য চিত্র দ্বাপরের,
দাঁড়াইয়া আছে গিরি সাক্ষী হয়ে যুগ-যুগান্তের।
দুর্গম কানন মাঝে একাকিনী অর্দ্ধবাসা নারী,
অরণ্যে ত্যজিয়া তারে চলে গেছে হৃদয়-বিহারী।
স্বামী অন্বেষিয়া সতী ফিরিতেছে প্রতি তরুতলে,
সিংহ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র গরজিয়া আসে ভীম বলে
সুকুমারী রাজবালা প্রাণভয়ে কাঁদিয়া উঠিল,
মৃগজীবি একজন আসি তথা সর্পে বিনাশিল।
হাসিয়া মাগিল প্রেম সমাজের নিন্দিত নিষাদ,
উপকৃতা—কিন্তু সতী ক্ষমিতে নারিল অপরাধ।
নয়ন-অনলে তাঁর বিনষ্ট হইল দুরাচার,
ভারতের নারী ইনি—বঙ্গবালা! কর নমস্কার।

[illegible]হের পুনঃ চিত্র অন্যতম,
সতীরে ধরিয়া বক্ষে কান্তারের কান্তি মনোরম।
সৌবীর নৃপতি আসি দাঁড়াইয়া সম্মুখে দেবীর,
কহিল মধুর কণ্ঠে প্রণয়ের [illegible]
নির্ভয়ে সংজ্ঞ সম্মুখে রাজবালা করিল উত্তর—
[illegible]-অযোগ্য বাণী কি সাহসে বল নৃপবর!”
[illegible]থে তুলি লয়ে তাঁরে যায় রাজা আপনার দেশ,
[illegible]ত্র-হৃদয়া সতী বসিলেন সমাহিত বেশে।
অচল অটুট ধৈর্য্য—চক্ষে তাঁর মহিমা রাজ্ঞীর,
হেরি’ সে অদ্ভুত ছবি বিচলিত হিয়া
ক্ষণ পরে পঞ্চ স্বামী উদ্ধারিল প্রিয়া আপনার,
ভারতের নারী ইনি—বঙ্গবালা! [illegible]র নমস্কার।

ওই দেখ রাজপুতা[illegible]য়,
চিতোর ধরিয়া বক্ষে আরাবলী গি[illegible]র শোভা পায়।
বন্দী ভীমসিংহ রাজা না বুঝিয়া পাঠান-ছলনা,
কেমনে করিবে মুক্ত ভাবে তা[illegible] সিংহের ললনা।
বিরলে বসিয়া সতী যুক্তি ক[illegible] আত্মীয়ের সনে,
প্রচার করিল—“আমি যাব আজ পাঠান-ভবনে।
সতীত্বের চেয়ে প্রিয় দয়িতের জীবন আমার,—”
শুনিয়া পাঠান-বক্ষে উচ্ছ্বসিত প্রীতি-পারাবার।
নারী-বেশী নর লয়ে রাজপুর পশিল সুন্দরী,
প্রিয়তমে উদ্ধারিয়া আপনা[illegible] গৃহে গেল ফিরি।
যুদ্ধ করে রাজপুত, পাঠানে[illegible] বিস্ময় অপার,
ভারতের নারী ইনি—বঙ্গবালা! কর নমস্কার।

১৩৩৩, ১৬ই শ্রাবণ রচিত—১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ “মাতৃমন্দিরে” প্রকাশিত]

স্মরণীয় ।

সুনীল [illegible] পরিপূর্ণ চাঁদিমার শোভা
যতনে আঁকিতেছিল ধরা-বক্ষে চিত্র [illegible]লোভা
তরুশিরে পড়েছিল সুহাসিনী কৌমুদী [illegible]
নিম্নতলে ছায়া—যেন সুচিত্রিত চারু আলিপনা ।
আনন্দে বহিতেছিল সুরভিত নিশীথ-সমীর,
আবেশ-বিহ্বলা ধরা হয়েছিল পুলকে অধীর ।
মাধবী যামিনী সেই বসুন্ধরা স্বপনে নিলীন,
প্রথম বিরহ-রাতি—সে আমার স্মরণীয় দিন ।

[১৩০০, [illegible]ই কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত]

আগমনী ।

বরষার অশ্রু-বিম্ব-বিম্বিত গগনে
শরতের ইন্দ্র ধনু হাসে,
সপ্তবর্ণ-সুষমায় জলদের বুকে
অপরূপ আনন্দ বিকাশে

প্রকৃতি চাহিয়া আছে বিমুগ্ধ নয়নে
উদ্‌ঘাটিয়া অন্তরের দ্বার,
বিহগ-কূজনে আর মধুপ-গুঞ্জনে
ভেসে ওঠে অমৃত-ঝঙ্কার ।

এস মা আনন্দময়ি ! দশদিকে আজ
আনন্দের শোভা বরষিয়া,
মমতা-মিলনে তব হবে বিপ্লাবিত
দুঃখ-তপ্ত [illegible]াইয়া।

[illegible]সবের কল-রোলে দাও মা ঢালিয়া
স্বপ্নময় সুরের বিলাস,
অশ্রু-বিম্বে বিম্বে মাগো হোক্ বি[illegible]াসিত
জীবনের সাফল্য-আভাস।

[১৩৩৫, ১৫ই আশ্বিন রচিত—অ[illegible]কাশিত]

আগমনী

শরতের দীপ্ত ঊষা ; সুরঞ্জিত দিক্‌চক্রবাল
অরুণের অলক্ত শোভায় ;
প্রকৃতি আনন হতে সরাইয়া কৃষ্ণ কেশজাল
হাসি মুখে চারিদিকে চায়।
পুষ্পিত শেফালি তরু, নিম্নে তার পড়িছে ঝরিয়া
বৃন্তচ্যুত কুসুম তাহার ;
কিশলয় স্তবকের বক্ষে বক্ষে উঠিছে হাসিয়া
রৌদ্র-স্নাত শিশির নিশার।
সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী, দ্বার প্রান্তে সিন্দুর-চর্চ্চিত
শোভা পায় মঙ্গল কলস ;
শিরে তার আম্রশাখা দিকে দিকে করে সঞ্চারিত
শরতের অমিয় পরশ।

ভিখারীর কণ্ঠস্বরে—প্রভাতের সমীর হিল্লোলে
ভেসে আসে আগমনী গান ;
হাসে ধরা, গাহে পাখী, তটিনীর মৃদু কলকলে
স্বপ্ন-মুগ্ধ ন... পরাণ।

বালিকা চাহিয়া আছে দাঁড়াইয়া প্রাসাদ-শিখরে
দূরস্থিত সরণীর পানে ;
প্রত্যাশিত দিন আজ, পিতা আজি আসিবেন তারে
লয়ে যেতে আপন ভবনে।
গণিয়া গণিয়া দি... অতি দীর্ঘ একটি বৎসর
কেটে গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
বহুদিন কর্ণ-পথে প...শ নাই পরিচিত স্বর ;
আনন্দে উজ্জ্বল নহে হিয়া।
শৈশবের ক্রীড়াভূমি, ...জননীর স্মিত মুখখানি
বক্ষে জাগে স্বপ্ন-স্মৃতি প্রায় ;
হৃদয় আকুল হয়, ওষ্ঠা...র অর্দ্ধস্ফুট বাণী
...গে উঠে নীরবে মিলায়।
আজি আসিবেন পিতা, ব্যা... চোখে চাহে বার বার
...লিসার উপরে ঝুঁকিয়া ;
কে ওই পথিক্ আসে, ওই ...ঝি জনক তাহার—
বালিকার প্রত্যাশিত হিয়া।
হায় ভ্রান্তি! পিতা নয়—...তিবাসী বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর
প্রবেশিল গৃহে আপনার ;
ভূতলে বসিল বালা, নিরাশায় আকুল অন্তর,
অশ্রুপ্লুত আঁখি দুটি তার।
ননন্দা আসিয়া তথা কলকণ্ঠে বলিল হাসিয়া,
"বাঁধ চুল, পর আভরণ—"

"আমার মায়ের কাছে দাও ভাই, দাও পাঠাইয়া"
বলিয়া সে ঢাকিল নয়ন !
বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে প্রত্যুত্তর হইল তখন
-কি কথা ! দরিদ্রের ঘরে-
আমার ...তার মত সম্মানিত ধনী একজন
পাঠাবেন কেমনে তোমারে ?
বাতুলতা ভুলে যাও, পর রত্ন অলঙ্কার,
পর এই নূতন বসন,"
বালিকা আনত মুখী, অশ্রু-সিক্ত কপোল তাহার,
অভিমান আকুলিত মন।
মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্রে সৌধ-শির উঠিল ভরিয়া,
তথাপি সে বসিয়া রহিল ;
শাশুড়ীর তিরস্কারে গৃহখানি উঠিল কাঁপিয়া,
আশঙ্কুরা নীরবে কাঁদিল।
বেলা অবসান-প্রায়, জীবনের চিরসাথী তার
ম্লানমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়,
স্বামীর চরণ তলে ঢেলে দিয়ে নয়ন-আসার
মাগে বালা আকুল আশায়।

দরিদ্রের জীর্ণ গৃহ ; গৃহস্বামী জ্বরতপ্ত দেহে
দাঁড়াইল বাহিরে আসিয়া,
গৃহিণীরে কহে ধীরে—'কন্যারে আনিব আজ গেহে,
লাঠিগাছা দাও আগাইয়া।"
গৃহিণী পশিল ঘরে, পীড়িতের মস্তক ঘুরিল—
কম্পমান হইল চরণ,
পড়িতে পড়িতে ভূমে ভিত্তি গাত্র চাপিয়া ধরিল,
অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন।

তখন ঊষার রবি স্বর্ণ-জ্যোতিঃ করে বিকীরণ
বিকশিত কাশ-সিতিমায়,
শরতের স্নিগ্ধ-স্পর্শে প্রফুল্লিত হয়ে সমীরণ
দিকে দিকে আনন্দ জাগায়
পূজার বোধন-গীতি ভেসে আসে কর্ণে দম্পতির,
হৃদয় হইল স্পন্দমান,
"গা তোল মেনকা রাণী"—শুনিয়া ঝরিল অশ্রুনীর,
মনে জাগে বিজয়ার গান।
গৃহিণী কাঁদিয়া বলে—"পূর্ণ আজ একটি বৎসর,
মা আমার গিয়াছে চলিয়া,
বিধাতা পাষাণ দিয়া গড়িল আমার কলেবর—
আছি তাই এখনো বাঁচিয়া।"
পীড়িত স্বামীর শির সযতনে উৎসঙ্গে লইয়া
আঁখি বারি মুছিল ত্বরায় ;
দিবসের অবসানে দীপ জ্বালি' শঙ্খ বাজাইয়া
কুটীরের প্রাঙ্গনে দাঁড়ায়।
অদূরে তুলসী বেদী, যুক্তকরে কহে বিষাদিনী
"সুখে রেখো বাছাকে আমার—"
সহসা শ্রবণে পশে সুধা-স্নাত-আনন্দ রাগিণী—
"মাগো, আমি এসেছি এবার।"
চকিতে ফিরিল নারী, সবিস্ময়ে দেখিল চাহিয়া
দাঁড়াইয়া জামাতা, নন্দিনী,
"গা তোল মেনকা রাণী"—স্মৃতি-পটে উঠিল ভাসিয়া,
চকিতা বিবশা জননী।

[১৩৩৩, ১৫ই আশ্বিন রচিত—১ম বর্ষ, "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

আগমনী।

আজি পুষ্প-কাননে গুঞ্জরে অলি,
মধুঝঙ্কৃত বিহগ-কাকলী,
ঝরিছে শেফালি সৌরভ ঢালি,
হাসিয়া উঠিছে ধরণী,
আজি প্রীতি-নির্ঝর বহায়ে ভারতে
আসিছে বিশ্ব-জননী

তাই সলিলে কমল উঠিছে বিকশি,
স্বর্ণ-আলোকে হাসে দিশিদিশি,
শ্যাম-শোভাময়ী প্রকৃতি রূপসী
ঢালিছে ললিত লাবণি,
তাই দীপ্ত আলোকে হাসিছে আকাশ,
নাচিয়া চলেছে তটিনী।

আজি সমীরে ভ্রমিছে বিহগ-কূজন,
জলদ-বিহীন মুক্ত গগন,
বিশ্ব-প্রকৃতি হর্ষে মগন,
আলোক-দীপ্ত সরণী,
আজি দুঃখ বেদনা দিতে ভুলাইয়া
বঙ্গে আসিছে জননী।

হের আসিছে জননী সিংহবাহনে,
স্বর্ণ-ভূষিত রক্ত বসনে,
মণি-বিজড়িত রত্ন-ভূষণে
সাজিয়া কনক বরণী,
হের বঙ্গমাতার অঙ্গনে আজি
আসিছে গিরি-নন্দিনী।

আগমনী

ওই দিকে দিকে হের ভাতিছে পুণ্য,
মহাজ্যোতিঃ মাঝে মিশিছে শূন্য,
বি[illegible]ক হয়েছে পূর্ণ
হেরিয়া দ[illegible]লনী,
ওই ঊর্দ্ধে হাসিছে রজত জলদ,
নিম্নে হাসিছে ধরণী।

আজি পুরনারীগণ অর্ঘ্য লইয়া,
চামরে মুকুরে ডালা সাজাইয়া,
সমুখে ধূপ, দীপ জ্বালাইয়া
বরিয়া লইছে জননী,
আজি শঙ্খ-আরাবে কাঁপিছে গগন,
হাসিছে কমলনয়নী।

আমি হৃদি-উপবনে যতনে ভ্রমিয়া,
ভক্তি-কুসুম চয়ন করিয়া,
গাঁথিয়া এ মালা বিরলে বসিয়া
ওগো শঙ্কর-ঘরণী,
আমি দিব অঞ্জলি চরণে তোমার
বিশ্ব-মানস-মোহিনী।

আজি হর্ষ-উজল পুণ্য শরতে
এস দেবী এই ব্যথিত মরতে,
আশীষ ঢালিয়া রিক্ত ভারতে
পূর্ণ করগো জননী,
আজি লইয়া আমার ভক্তি-অর্ঘ্য—
এস শিব-হৃদি-হরণী।

[১৩৩২, ৭ই আশ্বিন রচিত—অপ্রকাশিত।]

আবাহন।

মন্দিরে আজি বাজিছে শঙ্খ, অর্ঘ্য-পূরিত থালা,
জ্বলিছে প্রদীপ, কুসুম-পাত্রে শোভিছে পুষ্পমালা।
মঙ্গল-ঘট সিন্দুর-মাখা,
চন্দন-লিপ্ত আম্রশাখা,
চারু আলিপনা গৃহ-কুট্টিমে যত্নে দিয়েছে ঢালা,
কর্পূর, ধূপ, চামর, শঙ্খে পূর্ণ আরতি-ডালা।

এস মা শারদা, ভারতের বুকে এস মঙ্গলময়ী,
হের মা তোমার রক্ত-চরণে ভক্ত লুটিছে অই।
জীবন-সমরে যুঝিয়া শ্রান্ত
চরণে তোমার লুটিছে ভ্রান্ত,
তোমার আশীষে সন্তান তব সংগ্রামে হবে জয়ী,
দশ প্রহরণ ধর দশ দিকে ওগো মঙ্গলময়ী।

হোম-শিখা নয়—জীবনের শিখা জ্বলিয়া উঠেছে আজি,
উৎসবে আজি মাতিয়াছে সবে পুষ্প-ভূষণে সাজি।
কালিকার কথা ভুলেছে ভক্ত,
শক্তি সাধিয়া আনন দীপ্ত,
ললাটে ভাতিছে দৃপ্ত গরিমা, শঙ্খ উঠিছে বাজি,
জীবনের মায়া ভুলিয়া সাধক তোমারে পূজিছে আজি।

মণ্ডপতলে এস মা হাসিয়া ওগো বরাভয়-করা,
এস সনাতনী শক্তি প্রতিমা, দশ-প্রহরণ-ধরা।
স্বর্ণ-আলোকে পূর্ণ সরণী
হের ... হাসিছে ধরণী,
পড়িছে ঝরিয়া শুভ্র শেফালি, ঝরিছে ... ধারা,
ভারতের ... বরষি আশীষ এস বরাভয়-করা।

[১৩৩৩, ২০শে ভা... রচিত—১৩৩৩, আশ্বিনে "অর্চ্চনায়" প...

বো...নে বিজয়া

বাজিছে সানাই রহি... রহিয়া স্তব্ধ করুণ স্বরে,
অজানা বিষাদে আকু... হইয়া ধরণী কাঁদিয়া মরে।
ঝরিছে শেফা...ল অশ্রু ঢালিয়া,
হাহা রবে বায়ু ...লেছে বহিয়া,
চলেছে তটিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুদূরে সাগর-পুরে,
তরু-বীথিকায় গান গাহে পাখী বেদনা-মথিত সুরে।

অরুণ-অংশু ঢালে নাই আজ কষিত স্বর্ণ-আভা,
ফুল্ল কুসুম কাননের কো...ে আজি না বরষে শোভা।
সিংহবাহিনী জননী আমার,
দশ প্রহরণ করে শোভে যাঁর,—
সন্তানে দিয়া বরাভয় যাঁর দীপ্ত আনন-প্রভা,
তাঁহারে হেরিয়া আজ কারো মুখে জাগেনি হর্ষ-আভা।

নিশার প্রদীপ গৃহ-কোণটিতে তখনো জ্বলিতেছিল,
প্রভাত সমীর সুচারু পরশে আসিয়া নিভায়ে দিল।
জাগিল বিনয়, দেখিল সমুখে বিষাদ-প্রতিমাখানি,
নিকটে টানিয়া কহিল তাহার [illegible] কোমল পাণি।
"আসি তবে প্রীতি, হাসিমুখে দাও আমারে [illegible] আজ,
দুই দিন ছাড়া চিঠি দিব আমি ফেলিয়া হাতের কাজ"
স্নেহ-মূর্চ্ছনা [illegible]টিল বালার করুণ কণ্ঠস্বরে,
"কিছুতে কি তুমি পূজার পূর্ব্বে ফিরিতে পাবে না ঘরে?"
"ছুটি নেই আর, মনে রেখো প্রীতি, আসি তবে—গাড়ী এল,"
বধূর নয়ন মুছাইয়া দিয়া বিনয় চলিয়া গেল।
জানালার কাছে দাঁড়াইল বালা, যতটুকু দেখা যায়—
নাই, নাই, আর চিহ্ন নাই তার, দম্পতি কে কোথায়!
অজ্ঞাতে তার নয়ন প্রান্তে অশ্রু উঠিল ফুটি,
নিমেষের মাঝে গৃহ-কুট্টিমে তরুণী পড়িল লুটি।

([illegible])

সাঁজের প্রদীপ জ্বালিয়া প্র[illegible] কক্ষে পশিল আসি,
ললাট হইতে দিল সরাইয়া [illegible]-চিকুর রাশি।
অশ্রু-মলিন আঁখি-পাতা দুটি যতনে মুছিয়া বালা,
অঞ্চল হতে কুসুম ঢালিয়া গাঁথিতে বসিল মালা।
দূর দিগন্তে ঘনায়ে আসিছে নিবিড় তিমির-লেখা,
থেকে থেকে বালা মুখ তুলে চায়—যেন কার পাবে দেখা!
কোন মতে গাঁথি সুচিকণ হার আসিয়া ঘরের কোণে,
অঞ্চল দিয়া সঞ্চিত ধূলা মুছে নিল সযতনে।
কৌটা খুলিয়া সিন্দুর ঢালি' আলিপনা বিরচিয়া,
যতনে গ্রথিত ফুল-মালাগুলি রেখে দিল সাজাই'

(৫)

পূজার ষষ্ঠী-প্রভাতে বিনয় ফিরিয়া আসিবে ঘরে,
দয়িতের ঘর [illegible] যতনে স্নেহভরে।
ঊষার [illegible]রা উঠিল ফুটিয়া পূর্ব্ব-গগন কোণে,
[illegible]নিমনে বালা রয়েছে চাহিয়া দূর-প্রান্তর পানে।
রাঙা সাড়ীখানি লইয়া হস্তে শাশুড়ী [illegible]সিয়া ঘরে,
বধূর ললাটে সিন্দুর দিয়া বসন দিলে[illegible] করে।
নূতন বসন পরিয়া তরুণী প্রণাম ক[illegible]রল লুটি,
"অক্ষয় হোক্ মা হাতের লৌহ, [illegible]িদুর থাকুক ফুটি।"
ত্বরিত চরণে আপনার কাজে চলিয়া গেলেন মাতা,
স্মিতমুখে বালা আসি দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া ছিল যথা।
পূজার শঙ্খ উঠিল বাজিয়া সবাকার ঘরে ঘরে,
রঞ্জিতমুখী প্রতিমা তখনো দাঁড়ায়ে জানালা-[illegible]রে।
চরণে হাসিছে অলক্ত রাগ, লোহিত বরণ-বাস,
উজল-লোহিত সিন্দুরে [illegible]ভে কুঞ্চিত কেশপাশ।
সহসা শুনিল তাহাদেরি [illegible]রে ধ্বনি উঠে "হায় হায়"—
চমকিয়া সতী বাহিরে [illegible]সিয়া কারণ জানিতে চায়।
"আমার সোনার বধূর ললাটে এই কি গো লেখা ছিল?"
বিনয়ের মাতা কাঁদিয়া [illegible]ধূরে বক্ষে টানিয়া নিল।
স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াইল [illegible]লা, মুখে না সরিল বাণী,
হৃদয়-রকতে তখনো ত[illegible]র রঞ্জিত মু'খানি।

(৬)

শীতল নৈশ-সমীর বহিছে কাঁপাইয়া দশ দিক্,
মলিন চাঁদিমা ধরণীর পানে চেয়ে আছে অনিমিখ।
দিক্‌বালাগণ ঢেকেছে আনন নিবিড় কুয়াশা-বাসে,
ক্ষীণ জ্যোছনার চারু রেখাটুকু মেঘের আড়ালে ভাসে।

ফুটিয়া ফুটিয়া পড়িছে, ঝরিয়া নিশীথ-কুসুমগুলি,
শিশির সলিলে ভিজিয়া শেফালি চুমিছে ধরার ধূলি।
দূর-প্রান্তরে সামঘে... লি ঘোষিছে গভীর নিশা,
কাননের কোলে আঁধার নামিয়া আঁধা... লিখিছে দিশা।
দ্বিযামা রজনী, একেলা প্রতিমা বাগানে ব... আসি
শুভ্র ব...নে আবরিত দেহ, এলাইত কেশরাশি।
আভরণহ...ন চারু কর দুটি যুড়িয়া—আকাশ পা...
শান্ত আননে চাহিয়া যুবতী মগ্ন আপন ধ্যানে।
প্রহরের পরে প্রহর কাটিল, জ্যোছনা যায় না দেখা,
পূর্ব্ব-আকাশে উঠিল ফুটিয়া পাটল-বর্ণ রেখা।
তখনো প্রতিমা বসিয়া নীরবে যুক্ত যুগল করে,
আকাশের পানে রয়েছে চাহিয়া নয়নে মিনতি ভ'রে।

[১৩১৮, ২৪শে আশ্বিন রচিত—অপ্রকাশিত]

রজনীর প্রতি।

তুমি কি বুঝিবে সখী ... যাতনা মরমে আমার?
বুঝিবে কি দিবানিশি ...াণে কেন জাগে হাহাকার?
কতনা বেদনা পেয়ে শ...ীর ঢালি অশ্রুধারা,—
কে বুঝিবে? হায় সখি! কে জানিবে আমি লক্ষ্যহারা!
জগতে একেলা আমি, কেহ নাই—কিছু নাই মোর,
থাকিবার একমাত্র আছে শুধু নিয়তি কঠোর!
আর আছ তুমি দেবী! হেরিবারে যাতনা আমার,
শুনিতে বিষাদ-গাথা এই ক্ষুদ্র তাপিত হিয়ার।

শীতের নিশীথে কেহ যেতে নারে ঘরের বাহিরে,
তোমার নিকটে সখী তবু আমি আসি ঘুরে ফিরে।
প্রাণের বেদনা যত তোমারেই বলি নিতি নিতি,
রজনি! তোমারি কাছে পাই আমি হৃদয়ের প্রীতি।
সখী তুমি—প্রিয়া তুমি—এ জগতে তুমিই আমার,
[illegible]লি ভুলেছি আমি শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে তোমার,
তোমার স্নেহের কোলে ধরণী পড়েছে ঘুমাইয়া,
রুচিরা প্রকৃতি রাণী আত্মহারা তোমারে হেরিয়া।
ঘুমায়েছে তরুলতা, ঘুমায়েছে বিশ্ববাসী জন,
শুধুই তোমার পানে চেয়ে আছে আমার নয়ন!
কি নিয়ে ভুলিব বল জীবনের বিষাদ-ভাবনা?
আশা শুধু মরীচিকা—সে আমারে ভুলাতে পারে না।
আর কি জগতে আছে? কি দেখিয়া ভুলি আপনারে?
জান যদি বল দেবি! করি আমি মিনতি তোমারে।

[১৩২৬, ৩রা পৌষ রচিত—অপ্রকাশিত]

চিত্র

জীবনের বেলা-ভূমে দাঁড়াইয়া আমি
রয়েছি চাহিয়া,
পদতলে বয়ে যায় মরণ-তটিনী
তাণ্ডবে নাচিয়া।
দক্ষিণ আকাশ কোলে বসি দিবাপতি
ঢালিছে কিরণ,
নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘগুলি
ভাসে অনুক্ষণ।

কিন্তু তারা বাধা পেয়ে শত খণ্ড হয়ে
পুনঃ আসে ফিরে,
সাদা মেঘ কালো হয়ে তপনের প্রভা
রাখি[illegible] !
কিবা আছে বলিবার—আশাহত
কি বলিতে পারি ?
[illegible] বা ধরার বুকে ঢালিতে চাহিব
নয়নের বারি ?
তরুণ হৃদয়ে এঁকে বাসনার ছবি
কি দেখিব আর ?
জীবন-খেলায় গড়া বালুকার ঘর
ভেঙ্গেছে আমার !
অকালে জলদ আসি ঢাকিল তপনে,
দেখি চেয়ে চেয়ে,
সাদা মেঘ কালো হ'ল দেখি তা নয়নে,
বিস্মিত হৃদয়ে।
তটিনীর তীরে আমি আছি দাঁড়াইয়া,
নামিতে পারি না,
ডুবিতে বাসনা মনে—চরণ চলে না,
কেন তা জানি না।

১৩২৬, ১৫ই কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত।

মালা। ৭

ফুটিতেছে কুসুম-কলিকা,
উদ্যানে ঝরিছে শেফালিকা।
আঁধার যেতেছে স'রে, আলোক ফুটিছে ধীরে,
আধ আলো—আধ অন্ধকার
গাঁথিতেছিলাম আমি কুসুম-মালিকা।

ঝরা ফুল আঁচলে লইয়া
তরুতলে ছিলাম বসিয়া।
তখনো ফোটেনি রবি, উষার ললিত ছবি
জাগে নাই হাসাতে পৃথিবী ;
চারিদিকে ছিল মৃদু আঁধার ঘিরিয়া।

দূর আকাশের পানে চেয়ে,
ভাবিলাম বিমুগ্ধ হৃদয়ে—
যেমনি আঁধার সরে, আমিও অমনি ক'রে
ডুবে যাব অতীত-সাগরে ;
রবেনা আমার স্মৃতি ধরাতল ছেয়ে।

জগৎ আমারে ভুলে যাবে,
কিছু চিহ্ন কোথাও না র'বে !
পরিয়া হিরণ-ভূষা যেমন হাসিছে উষা,
আলোক-পরশে হাসে দিশা—
তখনো অমনিতর সবই হাসিবে।

মনোরমা ধরারে ছাড়িয়া
একা যাব কোথায় চলিয়া ?
জীবনের অবশেষে সময়ের স্রোতে ভেসে
চলি যাব কোন্ দূর দেশে ?
কোথায় রহিব আমি সবাকে ফেলিয়া ?

ছাড়িতে শোভনা বসুধারে
কখনো ত' হৃদয় না সরে !
বাস্তব জগৎ ফেলে কল্পনায় যেতে চ'লে
কাহারা সাধ নহে ধরাতলে,
স্মৃতির স্বপন ল'য়ে কে বাঁচিতে পারে ?

অনিলের মৃদুল নিঃস্বনে,
বিহঙ্গের মধুর কূজনে,
সীমাহারা ভাবনারি ঘুচিল আবেশ-ভার,
মালা গাঁথা হ'ল না আমার,—
গাঁথিনু চিন্তার হার ফিরিনু ভবনে।

[১৩২৫, ৫ই কার্ত্তিক রচিত—অপ্রকাশিত]

সন্ধ্যায়।

আজি এই নিরমল সাঁঝে
এস তুমি হৃদয়ে আমার,
এই ক্ষুদ্র মরমের মাঝে
আঁকি ও মূরতি তোমার
রজনীতে কোন কাজ নাই,
এ শুধু বিশ্রাম-অবসর ;

নিরালায় এ সময়ে তাই
পেতে চাই তোমার আদর।
মধুমাখা স্নেহভরা বাণী
এখন শুনিতে করি আশা,
দি—তাই এ হৃদয় খানি,
আর এ নীরব ভালবাসা।
জীবনের কালিমা আমার
দূর কর পুণ্যের আভায়,
মুছে দাও মনের আঁধার
উছলিয়া প্রেম-জ্যোছনায়
এস নাথ! এস তুমি আজ
প্রাণ ভরি' হেরিব মূরতি,
ও দুটি চরণ, বিশ্বরাজ!
প্রেম-দীপে করিব আরতি।

[১৩২৫, ১০ই আষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত]

৫

অজানা দেশ।

ভব-জলধির ধারে
নীলিমের পরপারে
কোথায় সে দেশ?
যায় কি তথায় দেখা
অরুণের জ্যোতি-রেখা,
আলোকের লেখা?

সেথা কি চাঁদিমা-তারা
বরষে অমিয়-ধারা
কিরণ ঢালিয়া ?
ঊষার তরুণ রবি,
ফুলের ললিত ছবি
ওঠে কি হাসিয়া ?
অনিল সাদরে আসি
দেহের সন্তাপ রাশি
লয় কি হরিয়া ?
নত শিরে তরু লতা
সৌরভ ঢালে কি তথা
কুসুমে ভরিয়া ?
অথবা বিষাদে ঢাকা
নিবিড় কালিমা মাখা
আঁধার সে দেশ ?
ভাসে না কি কভু তথা
চাঁদিমার মধুরতা,
আলোকের রেশ ?
কোথায় অনন্ত দেশ,
দেখিতে কেমন বেশ,
কি জানি কেমন !
জানিতে বাসনা হয়,
কেমন সে সুখময়
নীলিমা ভবন
সে দেশে যেজন যায়,
ফিরে না আসিতে চায়
কি সুখে ভুলিয়া ?

তথায় সংসার শ্রান্তি,
জীবনের শত ভ্রান্তি
যায় কি চলিয়া ?
দেহের যাতনা, ক্লেশ,
সেখানে কি হয় শেষ
জনমের তরে ?
চির শান্তিময় হ'য়ে
থাকে কি অমরালয়ে
মরতের নরে
জানিতে বাসনা হয়
অসীম রহস্যময়
অনন্ত বারতা,
কে আমার কাছে আসি
জানাবে সে তত্ত্ব রাশি,
শুনাবে সে কথা ?
ওই কুহেলিকা মাঝে,
ওই জলদের কাছে
ভ্রমে কি মানব ?
বিষাদ চাপিয়া বুকে
থাকে কি মলিন মুখে
হইয়া নীরব ?
কিম্বা অমৃতের স্রোতে
ভাসে ওই শূন্যপথে
আনন্দে ডুবিয়া ?
ধরার যাতনা, ক্লেশ,
দেহ সনে হ'য়ে শেষ
যায় কি চলিয়া ?

এদেশের ভালবাসা,
হৃদয়ের স্নেহ, আশা,
নাহি কি তথায়
এই সব সুখ-স্মৃতি,
জগতের হাসি, প্রীতি,
স্মরণে না রয় ?
আমরা সজল চোখে
চেয়ে থাকি ঊর্দ্ধলোকে
ব্যাকুল হতাশে,
তাহারা কি আমাদের
দুর্ব্বলতা হৃদয়ের
দেখে সদা হাসে ?
যে আমারে অশ্রুজলে
ভাসায়ে গিয়েছে চলে
অনন্ত পুরীতে,
আর কি তাহার সনে
কথা ক'ব ফুল্ল মনে,
পাব কি দেখিতে ?
হাসিভরা মুখখানি
সোহাগে হৃদয়ে টানি'
চুমিব কি স্নেহে ?
শোকাশ্রু সুখাশ্রু হয়ে
কপোলে যাবে কি বয়ে
প্রবল প্রবাহে ?
তার মরণের কালে
শুধুই চোখের জলে
ভেসেছি কাতরে,

কথা বন্ধ তিন দিন,
ভাষা হয়েছিল লীন
নয়নের দ্বারে ;
শেষ বিদায়ের কালে,
ভাসিয়া নয়ন জলে
দিই নি বিদায়
সে'ও ত' বিদায় ল'য়ে
যায় নাই তৃপ্ত হ'য়ে
ত্যজিয়া ধরায়।
ধরণী ছাড়িব যবে,
তখন কি দেখা হবে
পুনঃ তার সনে ?
"থোতি দিদি" বলি মোরে
আবার তেমন ক'রে
ডাকিবে যতনে ?
আমিও ব্যাকুল হ'য়ে
সাদরে হৃদয়ে ল'য়ে
চুমিব কি তারে ?
"আয় ভাই কোলে আয়"
বলিয়া কি অঙ্কে তায়
রাখিব আদরে ?
হতাশে হইয়া ভোর
বৃথা এ প্রয়াস মোর,
বৃথা অশ্রুজল !
আকাশে চাহিয়া থাকি,
কিছুই ত' নাহি দেখি
নীলিমা কেবল !

কোথাও কিছুই নাই,—
ছায়ারে রাখিতে চাই
আঁচলে বাঁধিয়া,
একি উন্মাদের সম
বিফল প্রয়াস মম
মায়াতে ভুলিয়া !

উজ্জ্বল জ্যোতির রেখা
নীলাকাশে যায় দেখা
জলদের পাশে,
ডুবিলে উহার কোলে,
মায়া মোহ দুঃখ ভুলে
মানব কি হাসে ?

তাই যদি সত্য হয়,
তবে শুন জ্যোতির্ম্ময় !
লও কোলে তুলে,
দেখিলে তোমার দেশ
ধরার যাতনা, ক্লেশ,
সব যাব ভুলে।

[১৩২৪, ২রা মাঘ রচিত—অপ্রকাশিত]

দিবাবসানে।

স্থবর্ণ প্রভায় ঘেরা সন্ধ্যার আকাশ,
নিবিড় কুহেলি-রাশি পূরবে ঘিরেছে আসি,
বহিতেছে ধীরে ধীরে শীতল বাতাস।

বিমুক্ত গগনতলে আছি দাঁড়াইয়া,—
পশ্চিম আকাশে বসি মৃদু মৃদু হাসে শশী,
ক্ষীণ জ্যোতিঃ ঢালে তারা মধুর হাসিয়া।

ফুরায়েছে দিবসের ছোট ছোট কাজ,
নাই কিছু কোলাহল, নাই জন-কলরোল,
বিজনে এসেছি তাই ওগো বিশ্বরাজ !

ধর তুমি দিবসের অবসাদ মোর,
বহিতে এ গুরুভার আমি ত' পারিনা আর,
এখন হইতে চাই তোমাতে বিভোর।

লও কাজগুলি, নাথ ! আমাকেও লও,
তোমারি চরণ তলে জীবন দিয়েছি ঢেলে,
স্নেহময় ! স্নেহভরে আঁখি তুলে চাও।

[এই কবিতার রচনাকাল কবির খাতায় নাই]

নীরবে।

রাম গিরি শিরে বসিয়া বিরহী চাহিয়া যেদিন আকাশ পানে
স্ফুটিত কুটজ-কুসুম-অর্ঘ্যে অর্চ্চনা করিল জলদগণে।
স্বাগত সম্ভাষ করিয়া আদরে কহিল অধীর করুণ স্বরে,
"আবর্ত্ত-পুষ্কর-বংশোদ্ভব তুমি, ইচ্ছারূপে ভ্রম' অম্বর 'পরে।
যাও জলধর দূর অলকায়, প্রেয়সী আমার যেখানে আছে,
ধনেশের শাপে খিন্ন এ দীনের বারতা কহিও তাহার কাছে।
অনুকূল বায়ু যেতেছে বহিয়া, চাতক গাহিছে মধুর গান,
তুমি যাও সুখে অবহিত গতি! এই অভাগার জুড়ায়ে প্রাণ।
মরাল শুনিয়া তব মধু-রব মৃণাল ছিঁড়িয়া লইবে সাথে,
যতদিন তুমি যাবে অলকায়—সঙ্গী হয়ে রবে আকাশ-পথে।"

সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আবরিত গিরি জলদ-জালে
হে যক্ষ-বণিতা, বসি অলকায় কোন্ সাধনায় নিমগ্ন ছিলে?
বাজাইয়া বীণা জয়-জয়ন্তীর সুরে কি ভরিলে কৈলাসপুরী—
অথবা এলায়ে রুক্ষ কেশজাল ভূতলে ঢালিলে নয়ন বারি?
কিম্বা বাতায়নে বসিয়া একেলা চাহিয়া সুদূর পথের পানে
মানস-নয়নে হেরিয়া প্রাণেশে হয়েছিলে মগ্ন তাহারি ধ্যানে?
কোন্ সাধনায় অয়ি পতিপ্রিয়া! লভিলে সখায় বরষ পরে,
সাক্ষ্য রাখে নাই শিলালিপি তার—ইতিহাস তাহা কভু না স্মরে

[১৩৩৩, ২০শে জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৪, আষাঢ়ে "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

পরশুরাম।

সহিবে না মানবের রুদ্র-অত্যাচার
হে ভার্গব! এই ছিল প্রতিজ্ঞা তোমার।
তাই তুমি ধরেছিলে সংহার-মূরতি,
দেখাইলে ক্ষত্রিয়েরে শক্তি অনুরতি।

দেখাইলে—একা বটে, নহ ক্ষীণ প্রাণ,
ক্ষাত্রবীর্য্যে কেহ নহে তোমার সমান।
নীরবে আনত শিরে স'বে অত্যাচার,
এমন দুর্ব্বল নয় প্রকৃতি তোমার।

যে বজ্র পড়িল আসি দ্বিজের মাথায়,
হৃদয়ে জাগিল শক্তি তারি প্রেরণায়।
একটি কুঠার মাত্র আশ্রয় করিয়া,
করিলে একুশ বার ধরা নিঃক্ষত্রিয়া।

যোগাসনে উপবিষ্ট জনক তোমার,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা নিল প্রাণ তাঁর।
সেই পাপে ক্ষত্রিয়ের বিপন্ন জীবন,
সেইদিন প্রতিহিংসা শিখিল ব্রাহ্মণ।

আজিও দেখিতে পাই প্রতি ঘরে ঘরে
সবলের অত্যাচার দুর্ব্বলের পরে।
কিন্তু ঋষি! কোথা তব প্রদর্শিত পথ?
কোথায় হেরিব পূর্ণ মন-মনোরথ?

নত শিরে সহে যারা রিপুর তাড়না,
কেমনে সফল হবে তাদের কামনা!
দয়া আর সবলতা শোভে পাশাপাশি,
আমি জানি সেই হিয়া চির অবিনাশী।

১৩৩২, ২রা জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৪, অগ্রহায়ণে "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আশ্রয়

রূপ নাই, গুণ নাই, স্বাস্থ্য নাই মোর,
প্রিয়তম! এ জগতে তুমিই আমার;
সুখ দুঃখ যাহা পাই প্রতি পলে পলে,
নিশায় টুটিয়া যায় স্বপন দিবার।
কিছু নাই এ জগতে তুমি আমি বিনা,
তাই নাথ! আমি তব চরণ ছাড়িনা।

[১৩২৬, ২১শে অগ্রহায়ণ রচিত—অপ্রকাশিত]

তপস্বিনী

(১)

তমসার পূত জলে উর্ম্মিকা ভাসিয়া চলে, ভেসে যায় রাজহংস-মালা,
প্রভাত-তপনে চুমি হাসিছে বনান্ত-ভূমি, চারিদিকে স্বর্ণ-জ্যোতিঃ ঢালা।
অঙ্কে তার সুশোভন বাল্মীকির তপোবন হাসিতেছে অরুণ-আভায়,
হবিঃগন্ধে পবিত্রিত সমীরণ সুরভিত ফিরিতেছে কানন-ছায়ায়।
কোথা যজ্ঞ-ভূমি 'পরে 'স্বাহা স্বাহা' ধ্বনি করে কুশাসনে মহাঋষিগণ,
লইয়া সমিধ-ভার পশিতেছে যজ্ঞাগার নতমুখে ঋষির নন্দন।
কোথায় বনের ধারে নব কিশলয় ভারে আবরিত তমসার তীর,
ঢেলে দিয়ে নির্ম্মলতা আসিয়া মিলেছে তথা পুণ্য-পূত বারি জাহ্নবীর।
কুসুম-পল্লবরাশি আনন্দে চলেছে ভাসি রবি-কর-বিম্বিত সলিলে,
মরতে অমৃত-খনি উদার প্রণবধ্বনি ভেসে যায় অনন্ত নিখিলে।
শিরে দীর্ঘ জটাপাশ, পরিয়া বাকল-বাস দাঁড়াইয়া উর্দ্ধ বাহু ঋষি,
ব্রত-স্নান সমাপিয়া নদী-নীরে দাঁড়াইয়া সাম গান গাহিছে সন্ন্যাসী।
বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে হরিণ-হরিণী ভ্রমে, অদূরে বহিছে প্রবাহিণী,
আশ্রম-কুটীর মাঝে বিরহ-মলিন সাজে বসি আছে জনক-নন্দিনী।
পবিত্র করুণ আভা বাড়ায় অঙ্গের শোভা, রুক্ষ কেশে শোভিছে সিন্দুর,
পাণ্ডুর কপোলে তাঁর জ্যোতিঃ ভাসে তপস্যার, আঁখি দুটি শান্ত সুমধুর।
দূরগত অতীতের চিত্রখানি প্রণয়ের লুকাইয়া হৃদয়ের তলে,
যুড়িয়া যুগল পাণি পুণ্যের প্রতিমাখানি ডুবিয়াছে সাধনার কোলে।

(২)

প্রতপ্ত নিদাঘকালে দীপ্ত সৌর-করজালে চারিদিকে জ্বালিয়া অনল,
শঙ্করের প্রতীক্ষায় প্রাণপাতী তপস্যায় গিরিজার জীবন সফল।
কণ্ঠে শোভে অক্ষমালা, করে রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে বাকল-বসন,
শিরে দীর্ঘ জটাভার, আনন আরক্ত তাঁর, অগ্নিতাপে অরুণ বরণ।

বরষার শ্যামতায় ধরণী ভরিয়া যায়, চারিদিকে সলিল-সম্পাত,
বন-ভূমি কাঁপাইয়া, গিরি-বক্ষ আলোড়িয়া ঘোরনাদে ছুটিছে প্রপাত।
কখনো উন্মত্ত বেগে অশনি ছুটিছে মেঘে, শৈল-শৃঙ্গ কাঁপে ঝটিকায়,
শিখরের অঙ্কগতা সুকঠিন তপোরতা আঁখি মুদি সময় কাটায়,
শিশির শীতলা ধরা কুহেলি-বসন প রা, তটিনীর অঙ্গ সুনির্ম্মল,
উদার নয়ন মেলি গগন দিতেছে ঢালি নদী-বক্ষে পুণ্য হিমজল।
দিকে দিকে তরুশিরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে শিশিরাক্ত আর্ত্ত সমীরণ,
শিখর-বালার কোলে পবিত্র শীতল জলে শৈলবালা সাধনা-মগন!
বসন্তের মঞ্জু হাসি কাননে উঠিল ভাসি, শ্যাম-শোভা অঙ্গে ব্রততীর,
নবকিশলয় দলে স্বর্ণাভ কিরণ জ্বলে, ফুল-গন্ধে আকুল সমীর।
উচ্চ হ'তে উচ্চতর বিহঙ্গের মধুস্বর শৈলপ্রস্থ পূরিল ঝঙ্কারে,
কেবল শিখর-সুতা প্রেম-ধারা-পরিপ্লুতা ভুলিয়া গিয়াছে আপনারে।
মুখেতে সরে না বাণী, প্রণয়ের ছবিখানি ভবিষ্যের অঙ্কে লুকাইয়া,
হৃদয়-নাথের পায় বিসর্জ্জিয়া আপনায় বসিয়াছে হিমাদ্রি-তনয়া।

(৩)

দৃশ্যপট সুমহান! অস্তগত বিবস্বান—তরুশিরে রশ্মি-লেখা জ্বলে,
রক্ত প্রতিবিম্ব তার জাগাইয়া অন্ধকার লুকাইল অরণ্যের কোলে।
চলে প'তি-কর-ধৃতা বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা অশ্বপতি রাজার নন্দিনী,
নয়নে আলোক নাই, দশদিক্ শূন্য তাই, তমোময়ী প্রকৃতি—ধরণী।
না গাহে কাননে পাখী, কুসুম-পরাগ মাখি সমীরণ ফিরে না নাচিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে শির তুলি কাঁদিছে পাদপগুলি পাণ্ডু-পত্র-অশ্রু বরষিয়া।
ঝিল্লী-মুখরিত দিশা ঘনায়ে আসিছে নিশা, হিংস্র পশু-সমাকুল বন,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, আঁধারে আঁধার-স্মৃতি! প্রকৃতির উচাটন মন।
চাহে বালা বার বার, দেখে শুধু অন্ধকার! দূরে দেখে আলোক আশার,
চাহে, পতি-মুখ পানে, ছায়া ভাসে ক্ষণে ক্ষণে—মৃত্যু করে প্রভাব বিস্তার।

অন্ধকার তরুতলে মৃত পতি লয়ে কোলে বসিয়াছে কাল-বিজয়িনী,
নাই কিছু অন্তরাল, সম্মুখেই মহাকাল—ঊর্দ্ধে হাসে ভাগ্য-বিধায়িনী।
হাসিল বিজলী-রেখা, সরিল আঁধার-লেখা, শমনের প্রফুল্ল নয়ন,
উৎসঙ্গে রাখিয়া পতি, সমাধি-মগনা সতী, নিয়তির আকুলিত মন।
প্রেমের মধুর প্রভা বাড়ায় বনের শোভা, অন্ধকারে আলো ভেসে যায়,
কোথা কর্ম্ম—কর্ম্মফল, অদৃষ্টের রুদ্রবল, বাধা কোথা প্রেমের পূজায়!
পরিপূর্ণ প্রণয়ের চিত্রখানি হৃদয়ের বর্ত্তমান লয়ে নিজ বক্ষে,
বিস্ময়-পূরিত মনে একমনে একধ্যানে চেয়ে আছে নির্নিমেষ চক্ষে।

[১৩৩৫, ২৮শে আশ্বিন রচিত—১৩৩৫, পৌষ "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

কাশী।

মিলিত বরণা অসি "পুণ্যভূমি বারাণসী" মহাজ্যোতিঃ মণ্ডিত সুন্দর,
শোভে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঙ্গার উত্তর ধারে ভারতের প্রাচীন নগর।
অতি পুরাতন কালে, আপনার বাহুবলে—(বাসব-নিদেশ শিরে ধরি),
সুদেব-নন্দন রাজা "দিবোদাস" মহাতেজাঃ রচিলেন এই মহাপুরী।
আসিয়া হৈহয়গণ করিয়া দারুণ রণ বারাণসী লইল কাড়িয়া,
দিবোদাস নৃপতির পুত্র "প্রতর্দ্দন" বীর যুদ্ধ করে আপনা ভুলিয়া।
বিজয়-লক্ষ্মীর বরে আবার আপন ঘরে পিতাপুত্র প্রবেশিল আসি,
সুকৌশলে অবশেষে ভুলাইয়া দিবোদাসে বিশ্বেশ্বর লইলেন কাশী।
কোন পুরাণের মতে,—কারণ-সলিল-স্রোতে নিমজ্জিতা ছিল বসুন্ধরা,
অন্নদা পূজার তরে শঙ্কর ত্রিশূল 'পরে স্থাপিলেন পুরী মনোহরা।
মতান্তরে শুনা যায়—শিব-শূন্য যজ্ঞ হয়—শিবপ্রিয়া দক্ষের নন্দিনী,
যজ্ঞ দেখিবার তরে আসিয়া দক্ষের ঘরে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনি'

ত্যজিল আপন কায়া ; স্কন্ধে লয়ে মৃতজায়া ফিরে শিব উন্মাদ অধীর;
কেশব করুণাময় ছড়াইল বসুধায় চক্রহতা সতীর শরীর।
দেবীর শ্রবণ-ভূষা বিনিন্দিত কোটি উষা "চক্রতীর্থে" পড়িল আসিয়া,
"মণিকর্ণিকা"র জল পুণ্য-পূত সুনির্ম্মল, সে শুভ-কুণ্ডল পরশিয়া।
"কালভৈরবে"র বেশে শঙ্কর নগরে পশে, "বিশালাক্ষী" আখ্যাতা শঙ্করী,
কেহ বলে" পীঠ-ভূমি"—কোথা "উপপীঠ" শুনি, মন্দির-মালিনী মহা পুরী।
মস্তকে সুবর্ণ-প্রভা, পুণ্য-কামী মনোলোভা মধ্যস্থলে বিশ্বনাথ-ধাম,
অদূরে বিরাজে তার চতুর্ব্বর্গ-শোভাধার অন্নপূর্ণা-গৃহ অভিরাম।
কিছু দূরে "জ্ঞানবাপী" ; শান্তি-আশে পাপী তাপী আসি'
করে বারি-পরশন,
সজ্জিত বিপনি শত দিকে দিকে শোভে কত ; যোগেভোগে অপূর্ব্ব মিলন!
শিখরবালার তটে পাষাণ বাঁধান ঘাটে শত শত শোভিছে সোপান,
সদা বেদ-নিনাদিত, "শিব শম্ভু" মুখরিত সুপবিত্র বারাণসী ধাম।
হরিশ চন্দ্রের ঘাট, মণিকার্ণকার তট, দিবানিশি চিতারাশিময়,
তবু যেন নাই শোক! আনন্দের মহালোক, কাশী যেন অমর-আলয়!
অসিধামে বিরাজিত পুণ্য-কীর্ত্তি-বিভাসিত "দুর্গাবাড়ী" রাণী ভবাণীর,
হিন্দু-কলেজের স্মৃতি "অ্যানি বেশান্তের" প্রীতি জাগায়েছে হৃদয়ে কাশীর।
জুড়ায়ে ধরার জ্বালা বহে হিমালয়-বালা গান গেয়ে অস্ফুট-কল্লোলে,
অমিয়-প্রবাহে তার অনন্ত প্রীতির ভার জেগে ওঠে মৃত্তিকার কোলে।
শঙ্করের পুণ্য-ধাম গাহে নির্ব্বাণের গান জাহ্নবীর তীরে দাঁড়াইয়া,—
অমৃত-ঝঙ্কারে তার পূর্ণকাল-পারাবার;—পরিপূর্ণ নিখিলের হিয়া!

[১৩৩৬, ২রা পৌষে রচিত—অপ্রকাশিত।]

দেবঘর

পুরাকালে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দুহিতা
পিতার শোণিত-জাত শরীর ত্যজিল শুচিস্মিতা।
সেই সতী-দেহ লয়ে আদর্শ প্রণয়ী পতি তাঁর
ত্রিভুবনে ভ্রমিলেন পাশরিতে বিরহ প্রিয়ার।
নিয়ন্ত্রিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি' নারায়ণ,
সুদর্শন চক্র দিয়া সেই দেহ কাটিলা তখন।
পড়িল একান্ন খণ্ড দিকে দিকে বক্ষে বসুধার,
পুণ্যময় তীর্থস্থান "পীঠ" বলি' হইল প্রচার।
ধরার ধারণাতীত সুপবিত্র হৃদয় মাতার
আসিয়া পড়িল যথা, সেই তীর্থ প্রণম্য সবার।
এই সেই "হার্দ পীঠ"—"দেওঘর" আখ্যায় প্রখ্যাত,
প্রকৃতি আনন্দময়ী নিশিদিন শ্যাম-শোভা-স্নাত।
সমুন্নত গিরিশ্রেণী শোভিতেছে দূরে—দূরান্তরে,
জলদের ধূসরিমা ঘনায়িত করিছে তাহারে।
প্রকৃতি বিরূপ যথা নাই তথা চিহ্ন শ্যামতার,
কঙ্কর-ধূসর গিরি শোভে ওই "নন্দন পাহাড়।"
এক দিকে 'ডিগ্‌রিয়া"—অন্য দিকে "ত্রিকূট" ভূধর,
মধ্যে শোভে "দেওঘর" প্রকৃতির চিত্র মনোহর।
সিকতার নিম্নস্তরে বহিছে "দারোয়া" অন্তঃশীলা,
প্রবাহ অধিক যথা সেখানেই সলীলের লীলা।
নাশিয়া লঙ্কেশ-কীর্ত্তি "কর্ম্মনাশা" নদী বয়ে যায়,
"মান-সরোবর" রাজা মানসিংহে স্মরণে জাগায়।
বহিছে শীকর-শূন্য সুরভিত গিরি-সমীরণ,
শ্যামল পল্লব দলে শোভিতেছে তরু অগণন।

"জয়দুর্গা" মহামায়া, "বৈদ্যনাথ" আখ্যাত শঙ্কর,
পাশাপাশি শোভা পায় দেবী-দেব-মন্দির সুন্দর।
চিরমিলনের চিহ্ন ক্ষৌম-সূত্র শীর্ষে বিলম্বিত,
শিবজলা "শিবগঙ্গা" মন্দিরের পার্শ্বে প্রবাহিত।
"হরিলাজুড়ী"তে আর কিছু দূরে "নন্দন" চূড়ায়,
"বাহান্ন বিঘা"য় দেখি শিব-লিঙ্গ যত্নে শোভা পায়।
"ত্রিকূটে" "ত্রিকূটেশ্বর"—"তপোবনে" "তপোনাথ" শিব,
হার্দপীঠে দেবতার শোভিছে প্রতিমা চিরঞ্জীব।
মায়ের এ বাস-ভূমি—ভুলিয়াছে অভাগা কুমার,
দিকে দিকে হেরি তাই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি দেবতার।
না করিলে নয় তাই পূজা হয় মায়ের এখন,
"বৈদ্যনাথ" পদতলে লুটিতেছে ভক্ত অগণন।
ভোগীর প্রাসাদ আর সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রম,
শোভিছে পুণ্যের আলো—অন্যদিকে বিলাস-বিভ্রম।
দিক্-চক্রবাল কোলে দাঁড়াইলে মলিনা উষসী,
প্রকৃতির চারু অঙ্গে ফুটে ওঠে শ্রান্ত শোভারাশি।
আরতির শঙ্খ বাজে, দীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে,
পুণ্য আর শান্তি যেন ব্যাপিয়াছে বিশ্ব চরাচরে।
প্রভাতে আসিয়া রবি হাসিমুখে যখন দাঁড়ায়,
কুলায় ছাড়িয়া পাখী বৈতালিক গান যবে গায়,
তখন সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ে মানবের প্রাণ,
আপন অলক্ষ্যে হয় দে[illegible]বারে নীয়মান।
মধ্যাহ্নে প্রতপ্ত ধরা পড়ে থাকে উদাসিনী প্রায়,
ঊষর ধূসর ভূমি ম্লানমুখে ঊর্দ্ধ পানে চায়;
উদাস আনন-ছবি তখন [illegible]হেরিয়া প্রকৃতির,
বিমুগ্ধ নরের প্রাণে [illegible]গ ওঠে বৈরাগ্য গভীর।

দেবতার পুণ্যভূমে রাজিতেছে শান্তি, আশীর্ব্বাদ,
ব্যথিত আসিলে হেথা ক্ষণতরে ভুলিবে বিষাদ।
জননি! চাহিয়া দেখ, পদতলে দুহিতা তোমার,
স্বাস্থ্য নাই—শক্তি নাই, বক্ষে জাগে ব্যর্থ হাহাকার।
নিয়তির পরিহাসে আশাহত জীবন আমার,
শান্তির আশায় তাই আসিয়াছি নিকটে তোমার।
যে শক্তি প্রভাবে তুমি স্বামী-নিন্দা শুনিলে না কাণে,
সেই শক্তি-কণা আজ ভিক্ষা মাগি তোমার চরণে।

[১৩২৯, ১০ই আশ্বিন রচিত—১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

প্রতিশয়।

প্রণয়, করুণা, স্নেহ, আকাঙ্ক্ষার স্তরে স্তরে
তোমার পবিত্র কান্তি আঁকিয়াছি প্রীতি ভরে।
বিজন সন্ধ্যায় আজ
হে প্রিয়, জীবন-রাজ!
প্রতিচ্ছবি-পদতলে লুটিতেছি যুক্ত করে।

কত যে আকুল আশা, কতখানি কাতরতা,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে কত যে বিফল ব্যথা;
তরঙ্গিয়া মহাব্যোম,
উদ্ভাসিয়া রবি-সোম
তোমার চরণ তলে ছুটে যায় কত কথা-

সে কি তুমি জান নাগ ! জান কি ত' লীলাধার !
দেখেছ কি কাম-লোকে স্থূল প্রতিবিম্ব তার ?
রূপ-ভূমি আবেষ্টিয়া
সূক্ষ্ম অণু বিরচিয়া,
দেখেছ কি মহাশূন্যে ছায়া ভাসে বেদনার ?

যদি দেখে থাক প্রিয়, কেন তবে আছ দূরে ?
আশ্বাস জাগেনা কেন ধারণা-বীণার সুরে ?
তোমারি চরণ তলে
জীবন দিয়েছি ঢেলে,
তবে কেন ক্ষমা নাই কামনার অন্তঃপুরে ?

[রচনাকাল ১৩৩৫,—অপ্রকাশিত]

উদ্বোধন।

আবার জাগো হে বঙ্গের বীর,
উজ্জ্বল কর মায়ের বক্ষ,
অতীতের সেই কীর্ত্তি-গরিমা
তা' আবার হউক লক্ষ্য।

কর্ম্ম-সাগরে ডুবে যাও সবে,
ফিরে আনো সেই অতীত শক্তি,
"অসাধ্য কিছু হতে না পারে,"
এই ত প্রকৃত বীরের উক্তি।

নব উৎসাহে কর্ম্ম-আবেগ,
অন্তর মাঝে জাগাও নিত্য,
বুঝুক সকলে বক্তৃতা নহে—
আর্য্যেরা বীর একথা সত্য।

মানুষ হইতে পারিবে না শুধু
বিলাসের স্রোতে ভাসায়ে চিত্ত,
অথবা শুধুই অতীতের সেই
পুরাতন পথে চলিয়া নিত্য।

সঙ্কীর্ণ নয় কর্ম্মের পথ,
ছোট নহে এই অসীম বিশ্ব,
ব্যর্থ নহে এ মানব-জীবন,
মিথ্যা নহে এ ধরার দৃশ্য।

বসিয়া থাকিলে চলিবে না আর,
করিবার আছে অনেক কর্ম্ম,
শিখিবার আছে জীবনে অনেক,
অলসতা নহে নরের ধর্ম্ম।

মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া
নত শিরে হও সবার ছাত্র,
অনার্য্য [illegible] তুচ্ছ কোরো না,
[illegible] [illegible] হিক পাত্রাপাত্র।

আর্য্য-প্রধান বৃহস্পতির
পুত্র [illegible] দেখ করিতে শিক্ষা,
অনার্য্য-গুরু শুক্রে [illegible] কাছে,
মাথা নত করি [illegible] দীক্ষা।

প্রতীচ্য বীর তুলিয়াছে শির
জয়ের মুকুট পরিয়া শীর্ষে,
রুদ্র তেজের প্রভাবে তাদের
সমান তুলনা মিলে কি বিশ্বে?

পারো কি তাদের "ম্লেচ্ছ" বলিয়া
ঠেলে ফেলে দিতে না করি গ্রাহ্য,
থা সে শক্তি—কি করিয়া বল
দিবে পরিচয় "আমরা আর্য্য?"

হে বঙ্গবীর! আর কত দিন,
রহিবে এমন হইয়া ঘৃণ্য—
দাসত্বই সার ভাবিয়াছ সবে,
এই কি জাতির গৌরব-চিহ্ন!

আবার জাগ হে পূর্ব্বের মত,
ফিরে আনো সেই অতীত গর্ব্ব,
সবাই উঠেছে মাথা তুলে আজ,
বাঙ্গালী কি শুধু রহিবে খর্ব্ব?

[রচনাকাল, অনুমান ১৩২৬—অপ্রকাশিত]

অঞ্জলি

(কবির মেজ জ্যেঠা মহাশয় স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত)

দশ বর্ষ পূর্ব্বে তাত ! চৈত্রমাসে সংক্রান্তি দিবসে,
নিশার প্রথম যামে ধরা হতে লয়েছ বিদায় ;
তার প’রে মধুমাস ফিরে আসে বরষে বরষে,
ধরণী হাসিয়া ওঠে কুসুমিত বসন্ত-শো[illegible]য় ।
আত্মহারা বিশ্ববাসী ছোট বড় কাজে আপনার,
তোমারে স্মরিতে দেব আছে আজ সময় কাহার ?

তোমার “শঙ্করাচার্য্য”—পুণ্য-পূত “রামানুজ-কথা”—
“দক্ষিণা-পথে”র সেই মনোরম “ভ্রমণ”-কাহিনী,
বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাগাইয়া নিজ পবিত্রতা,—
পাঠক স্মরিবে তব সুধামাখা অমর লেখনী ।
ভাষা-জননীর গলে পরায়েছ মণিময় হার,
সমাজ পবিত্র হ’ল পেয়ে তব রচনা-সম্ভার ।

লিখিতে বাসনা ছিল আর্য্যাবর্ত্ত-ভ্রমণ কাহিনী,
সে আশা-প্রদীপ হায় অকালেই হ’ল নির্ব্বাপিত ;
স্মৃতির সাগরে তব ছিল কত জ্যোতির্ম্ময় মণি—
লেখনীর মুখে ছিল মালিকার সূত্র বিলম্বিত ।
অকালে চলি[illegible] গেলে অতি দূরে পুরী অমরায়,
গ্রথিত হ’লনা মালা, সূ[illegible] ধূলায় লোটায় !

একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে—বিবাহের প্রীতি-উপহার
রচিয়া—দিলাম তাত, হা[illegible]মুখে পড়িতে তোমায় ;
বিস্মিত হইলে তুমি শক্তি[illegible]খে ক্ষুদ্র বালিকার,
বলিলে—“হও মা রত চিরদিন সাহিত্য-সেবায় ।”

রাখিতে তোমার কথা সাধ ছিল অন্তরে আমার,
কিন্তু আজি স্বাস্থ্য-শক্তি-বিদ্যা নাই সেই বালিকার।

শোভাহারা বন-ফুলে—নিরমল অশ্রু-উপচারে—
দশ বৎসরের পরে প্রণমিতে এসেছি তোমায় ;
সামান্য সাধনা মোর—শক্তি নাই বন্দিতে তোমারে,
সুরভিত পুষ্প দিয়া গাঁথি নাই চারু মালিকায়।
বারেক প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়া সম্মুখে আমার,
জ্যেষ্ঠ তাত ! লও আজি তনয়ার ভক্তি-উপহার।

[১৩৩২, ২০শে ফাল্গুণ রচিত—অপ্রকাশিত]

অঞ্জলি।

(কবির সেজ জ্যেঠা মহাশয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত)

অতীত-সাগর-গর্ভে চির বিমজ্জিত
আজি তাত ! তোমার মূরতি,
আমাদের হিয়া মাঝে অনন্ত অ[illegible]ত
তব নাম-[illegible]-প্রীতি।

ভারতীর কুঞ্জ হতে বিকশিত ফুল
অকালে ঝরি[illegible] ভূমি 'পরে,
সমীরে মিশিয়া [illegible]র সৌরভ অতুল
লুকাইল দূরে—লোকান্তরে।

অসমাপ্ত মধ্যপথে "তেঙ্গুর" "কেঙ্গুর"
পূরিলনা হৃদয়ের আশা,
বিশ্ব-বিদ্যালয় তরে রচনা মধুর—
কিন্তু, নাহি মিটিল পিয়াসা।

কত গ্রন্থ দিয়া গেলে ভারত মাতারে,
করিয়াছ কত আবিষ্কার,
সাহিত্যের পরিষদ্ আজিও তোমারে
দিতেছেন প্রীতি-উপহার।

কত শত বৌদ্ধ-গ্রন্থ অমিয়-আধার
হয়েছিল অবসান-প্রায়,
তুমিই উদ্ধার করি দিলে উপহার
ভক্তিভরে ভারতীর পায়।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি লক্ষ্যে সাফল্য লভিল
বহুমুখী প্রতিভা তোমার,
ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল হইল
গর্ব্বে ধরি অমর কুমার।

শ্রমণ আসিলে গৃহে, অথবা ব্রাহ্মণ—
প্রীতিভরে তুমি সেই ক্ষণ
প্রীণিত করিতে সবে, বিনয়-বচন
ছিল তব অঙ্গ-ভূষণ।

তোমার মধুর স্নেহ, প্রিয়-সম্ভাষণ,
প্রার্থনীয় ছিল সবাকার,
আজিও সজল চোখে স্মরে পরিজন
স্নেহ-স্মিত আনন তোমার।

সেই সাথে জ্যেষ্ঠ তাত, স্মৃতির ফলকে
আঁকা আছে চিত্র সকরুণ,
তেরশ' সাতাশ সালে বারই বৈশাখে
ঝরে তব জীবন-প্রসূন।

অনির্ব্বাণ চিতা তব হৃদয়ে ধরিয়া
ম্লান মুখে ফিরে গৃহবাসী,
হের তাত ! আজি তব ভবন ভরিয়া
উথলিয়া উঠে অশ্রুরাশি।

এ অশ্রু—পবিত্র অশ্রু, বারি জাহ্নবীর
নহে কভু সমান ইহার,
তব স্মৃতি-বিজড়িত এই অশ্রুনীর
ভক্তি-প্রীতি-মঙ্গল আধার।

তোমারে স্মরিয়া আজি যুড়ি দুটি হাত
মাগিতেছি তোমার প্রসাদ,
তনয়া প্রণাম করে—স্নেহভরে তাত !
কর আজি শুভ আশীর্ব্বাদ।

[১৩৩২, ১৪ই চৈত্র রচিত—অপ্রকাশিত]

অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

সমীপেষু—

হে দেব, হে স্নেহময়, চির পূজনীয়,
কেমনে তোমারে দিব প্রণাম আমার?
কমলার বরপুত্র—ভারতীর প্রিয়,
ব্যবহারাজীব, কিন্তু উন্নত-উদার।
"কনক-রেখা"র বুকে হিরণ-লেখায়
ফুটিয়া উঠিছে তব পবিত্র অন্তর;
"অর্চ্চনা"র "নানা কথা" সহস্র শোভায়
সাহিত্যের বুকে ঢালে প্রীতির নির্ঝর।
তোমার মধুর স্নেহ জীবনে আমার
এনেছে সুরভি-স্নাত নব জাগরণ;
অপটু হস্তের এই রচনা-সম্ভার
তোমারি উৎসাহ-বাণী করায় স্মরণ।
কৃতজ্ঞতা-প্লুত এই ক্ষুদ্র উপহার
সাদরে এনেছি তাই চরণে তোমার।

[১৩৩৪, ১লা চৈত্র রচিত—অপ্রকাশিত]

[illegible]

অগ্রজ প্রতিম তুমি পূজনীয় শুভার্থী আমার,
আমি তব চির স্নেহ[illegible]তা,
স্নেহের আলোক তব দূর করে[illegible]ম শূন্যতার,
জাগাইয়া আনন্দ-সবিতা।

ধরণীর এক প্রান্তে—ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম আমি
বাস্তবের চেতনা ভুলিয়া
কল্পনার স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করি দিবা যামী
অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া।

দেখি শুধু, আঁকা আছে জগতের বিশাল উরসে
একখানি চিত্র অকরুণ,
বর্ণ নাই—শোভা নাই ; নিরবধি রেখার বিন্যাসে
জেগে ওঠে প্রলয়-আগুণ !

সভয়ে ফিরায়ে আঁখি চেয়ে দেখি হৃদয়-গগনে
মহাশূন্য অনন্ত অপার !—
আপনারে সমর্পিয়া বক্ষে তার অতি সঙ্গোপনে
ভ্রমিতেছে অশ্রু হতাশার।

তাই ল'য়ে দিন কাটে, তাই ল'য়ে স্বপন রচিয়া
ব্যর্থতায় হেরি সার্থকতা,
সহসা তোমার স্নেহ আনন্দের পরশ ঢালিয়া
জানাইল নবীন বারতা।

এ স্নেহ—নির্ম্মল স্নেহ, জগতের তুলনীয় নয়,
অমরায় জনম ইহার,
জানাইয়া কৃতজ্ঞতা আমি এই স্নেহের শোভায়
করিব না মালিন্য সঞ্চার!

[১৩৩৫, ৩০শে আষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত]

ব্যথিতার গান।

বাগানের এক প্রান্তে
ফুটে আছে সূর্যামুখী ফুল,
অমল সুষমা নাই,
নাহি তার সুরভি অতুল।
তবু সে চাহিয়া আছে
নিশি দিন আকাশের পানে,
জীবন জুড়াবে তার
চিরপ্রিয় দেবতার ধ্যানে।

চারুলতা

(জানালার ধারে ।)

পরিখার পরপারে শোভা পায় শ্যামল প্রান্তর,
নিবিড় বনের রেখা শোভিতেছে পিছনে তাহার ;
উপরে অনন্ত শূন্যে ভাসিতেছে চারু জলধর,
নিম্নে ভাসি সমীরণ হিল্লোলিত বক্ষে পরিখার।
অস্তাচলগামী রবি চেয়ে আছে করুণ নয়নে,
স্বর্ণাভ কিরণ টুকু জ্বলিতেছে গাছের পাতায়,
ধরণী মলিন মুখে অঙ্গ ঢাকি ধূসর বসনে
একটি নিশার তরে প্রিয়তমে দিতেছে বিদায়।
গাহিয়া মধুর গান পাখীগুলি ফিরে যায় নীড়ে,
সমীরে ভাসিয়া যায় সুমধুর কলরব তার ;
পূরব আকাশ খানি ভরে গেল তরল তিমিরে,
পশ্চিমে ফুটিয়া আছে মৃদুতর জ্যোতি লালিমার।
দ্বিতলের বাতায়নে একাকিনী দাঁড়াইয়া শোভা
বিস্ময়ে হেরিতেছিল প্রকৃতির চিত্র মনোলোভা।

নিবিড় হইল নিশা—সমীরণ বহিল প্রবল,
কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার শশী দেখা দিল মে[illegible]র আড়ালে ;
আকাশে উঠিল ফুটি [illegible]গুলি দীপ্ত সমুজ্জ্বল,
ঘনায়ে আসিল মেঘ নারিকেল তরু-অন্তরালে।
তখনো আঁধার ঘরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের পাশে,
তরুণী হেরিতেছিল [illegible]ধারে বিস্মিত হইয়া ;
বিচূর্ণ চিকুর রা[illegible]রে ধীরে উড়িল বাতাসে,
নির্ম্মল [illegible]তলে চিন্তা-রেখা উঠিল ফুটিয়া।

কাহার মধুরতম কণ্ঠস্বরে চমক্ ভাঙ্গিল,
ফিরিয়া দেখিল বালা কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া পতি ;
মলিন আননখানি সেইক্ষণে উজ্জ্বল হইল,
হাসিমুখে দাঁড়াইল দয়িতের নিকটে যুবতী।

* * *

শ্রাবণের বিভাবরী—মেঘাবৃত সুনীল আকাশ,
বিজলী উঠিছে জ্বলি ক্ষণে ক্ষণে তিমির নাশিয়া ;
রুদ্ধ কক্ষদ্বারে আসি ফিরে গেল কাঁদিয়া বাতাস,
শুনিয়া জীমূত-ধ্বনি বসুন্ধরা উঠিল কাঁপিয়া।

*

বুঝিল গভীর রাত্রি ঘটিকার নিকটে আসিয়া,
তাপমান যন্ত্র লয়ে শরীরের উত্তাপ দেখিল।

* * *

জ্বরের আবেগে তার দেহখানি পড়িল হেলিয়া,
সহসা নয়ন দুটি অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

* *

দিনে দিনে বাড়ে পীড়া—হয়ে আসে শরীরের ক্ষয়,
কর্ত্তব্য ভাবিয়া স্বামী সাধ্যমত চিকিৎসা করিল ;
একদা শুনিল দোঁহে এই পীড়া সারিবার নয়,
মৃত্যুর আশঙ্কা নাই—[illegible] শুধু ভাঙ্গিয়া রহিল।

* * *

কেটে গেল দুটি মাস—আশ্বিনের নির্ম্মল গগনে
মধুর হাসিতেছিল পূর্ণিমার [illegible] শশধর ;
কৌমুদী-চর্চ্চিতা ধরা হাসিমুখে [illegible]প্রেম নয়নে
আদরে হেরিতেছিল নীলাম্বুধি বিশাল [illegible]।

নারিকেল তরুশিরে কুলকণ্ঠে গাহিছে কোকিল,
সমীরে ভাসিতেছিল অপরূপ ঝঙ্কার তাহার ;
উল্লাস-লহর স্রোতে ভেসে যায় অনন্ত নিখিল—
ধরণী আনন্দময়ী বক্ষে ধরি চিত্র জ্যোছনার।

আকাশে হাসিছে শশী, ভূমিতলে হাসিছে দম্পতি,
ফুটিয়া উঠিল বিশ্বে অপরূপ আনন্দের জ্যোতিঃ।

* * *

শুধু শোভা একাকিনী দাঁড়াইয়া জানালার ধারে
বিষাদে করিতেছিল রজনীর প্রহর-গণনা ;—

* * *

ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল গণ্ডস্থলে,
অবশ হইল দেহ, শরীরের উত্তাপ বাড়িল ;
বাতাসে অলক দাম লুটাইল ললাটে, কপোলে,
শ্রান্তিভরে শোভাময়ী বাতায়নে মস্তক রাখিল।
উপরে হাসিতেছিল জ্যোতির্ম্ময় বিভাবরী পতি,
ভূতলে বিষাদময়ী দাঁড়াইয়া পীড়িতা যুবতী।

* * *

স্বাস্থ্যহারা হয়ে বালা খাটিবার শক্তি হারাইল,
আত্মীয়া করিত কাজ শোভাময়ী দেখিত চাহিয়া ;
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি অশ[illegible] ভাবিতে লাগিল,
“আমি ত জীয়ন্তে মরা—কেন আর রয়েছি বাঁচিয়া !
এ জন্মের মত হায় ফুরাইল সুখ, সাধ, আশা,
জীবনের শত কাজ শক[illegible]কে রহিল পড়িয়া ;
ব্যর্থ এ শরীর মোর-[illegible]ব্যর্থ এই দীন ভালবাসা,
নারায়ণ! [illegible]ও কি করিব বাঁচিয়া থাকিয়া ?”

আত্মীয়া বলিল, "ভাই, কি ভাবিছ বসিয়া নীরবে?"
হাসিয়া বলিল শোভা, "ভাবি উপনিষদের বাণী,
দুই পক্ষী একবৃক্ষে বসে আছে অতুল গৌরবে,
একজন ফল খায়, চাহিয়া দেখিছে অন্য প্রাণী।
তুমি সে জীবাত্মা পক্ষী— কর্ম্মফল ভুগিছ আপন,
মুক্ত পরমাত্মা আমি কর্ম্ম তব করি দরশন।"

* * *

প্রভাতে অরুণাকাশে নবোদিত তপনের জ্যোতিঃ
ঢালিল ধরার বুকে দেবতার স্নেহাশীষ ধারা;
বৈতালিক গান গায় পাখীগুলি আনন্দ-মূরতি,
বেলার বাঁধন মাঝে পরিখা বহিছে আত্মহারা।
সেদিন ছিলনা জ্বর—দাঁড়াইয়া জানালার পাশে
রাজপথ পানে চেয়ে দেখে শোভা কর্ম্ম-কোলাহল;
ভূতলে ছুটিছে গাড়ী, পাখীগুলি উড়িছে আকাশে,
পথিক আপন কাজে চলিয়াছে আনন্দ-বিহ্বল।
একটি নিশ্বাস ছাড়ি দর্পণের নিকটে আসিয়া
করুণ নয়নে বালা হেরিল আপন প্রতিকৃতি;
যে দেহ শ্মশানে সাজে ঘরে তাহা কি কাজ রাখিয়া?
স্বাস্থ্য গেল—গেলনা ত আনন্দের কামনা ও স্মৃতি!
হে দেব! শুনেছি তুমি জগতের মঙ্গল কারণ,
দুঃখিনীরে রুগ্না করি সাধিয়াছ কোন্ প্রয়োজন!

* * *

(প্রাসাদ-শিখরে।)

তখন গভীর রাত্রি, সৌধ শিরে বসিয়া একেলা
যুবতী হেরিতেছিল আপনার অদৃষ্টের ছবি ;
সপ্তদশ বৎসরেই ভেঙ্গে গেল আনন্দের মেলা,
জীবন-গগনে হায়, প্রভাতেই অস্তমিত রবি !

*   *   *

জগদীশ, ভিখারিণী বর চায় চরণে তোমার,
শোভা যেন নাহি হয় কাহারও দুঃখের কারণ ;
শোভার চোখের জল কভু যেন না দেখে সংসার,
চিরদিন ব্যথিতার থাকে যেন প্রশান্ত আনন।

*   *   *

শূন্য মনে শোভাময়ী ভ্রমিতেছে প্রাসাদ-শিখরে,
বিমুক্ত কুন্তলে তার মুখখানি অর্দ্ধ-আবরিত,
দৃশ্যমান যাহা কিছু লুপ্ত সবি আঁধার-সাগরে,
তরুণী হেরিল শুধু মহাশূন্য বিশ্বে প্রকটিত।
শূন্য জল, স্থল, ধরা—শূন্যময় আকাশ-মণ্ডল,
শূন্যতায় পরিণত জীবনের সুখ-সাধ-আশা,
ধরার বিশাল বুকে জাগিতেছে শূন্যতা কেবল,
মানবের বুকে জাগে তৃপ্তিহীন অনন্ত পিয়াসা !
"কোথা তুমি দয়াময় ! কোথা তুমি জগতের নাথ
দুর্ব্বলা নারীর বুকে কর [illegible]জি শক্তি-সঞ্চারণ ;
স্বামীর কারণে আমি পারি যেন সহিতে আঘাত,
ধরাতা[illegible] স্বর্গ মোর দয়িতের পবিত্র চরণ।"
যুক্ত করে শোভাময়ী ঊর্দ্ধ চাহি প্রণাম করিল,
ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা ভূমিতলে ঝরিয়া পড়িল।

*   *   *

(কক্ষে ।)

শিশির-শীতলা নিশা, হেমন্তের শ্রান্ত সমীরণ
বহিছে ধরার বক্ষে ঢেলে দিয়ে শীকর সম্ভার ;
ঝিল্লীরুত তমস্বিনী—চরাচর সুষুপ্তি মগন,
শুধু শোভা একাকিনী জেগে আছে কক্ষে আপনার।

*　　　　*　　　　*

রজনীর শেষ যামে শোভাময়ী লুটিল শয্যায়,
জ্বরের আবেগে আঁখি রক্তবর্ণ হইল তাহার ;
মাথায় অসহ্য ক্লেশ—কণ্ঠ শুষ্ক তীব্র পিপাসায়,
প্রবল জ্বরের ঘোরে ভুলিল সে চেতনা ধরার।
সারা দিন কেটে গেল—তপনের অবসান কালে
চৈতন্য পাইয়া বালা ধীরে ধীরে মেলিল নয়ন ;—

*　　　　*　　　　*

দিন যায়—মাস যায়—ধীরে ধীরে চলিল বৎসর,
করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা শোভাময়ী সময় কাটায় ;
কখনো বাসনা হয় রচিতে কবিতা মনোহর,
শিক্ষার অভাবে তার ভাব—ভাষা হারাইয়া যায়।
নীরবে বিজন ঘরে একাকিনী শুইয়া বসিয়া
শ্রান্ত হয়ে শোভাময়ী ভ্রমে কভু প্রাসাদ-শিখরে ;
কখনো মলিন মুখে পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া
জনতার কোলাহলে হৃদয়ের বেদনা পাসরে।

*

সম্মুখে রাখিয়া বাতি—"কাদম্বরী" গ্রন্থ হাতে লয়ে
তরুণী ভাবিতেছিল চিত্র[illegible]নি গন্ধর্ব্ব বালার ;
পূজিল যাহারে সতী দিবা[illegible] অনন্য হৃদয়ে
শমনের সাধ্য নাই বিনাশিতে জীব[illegible]হার।

কোথা সেই মনিময় পর্য্যঙ্কের শয্যা সুকোমল !
কোথায় বিলাস-সজ্জা—কোথা রত্ন-ভূষণ-শিঞ্জন !
নির্জ্জন কানন মাঝে পশু পক্ষী ভ্রমিছে কেবল,
কাদম্বরী বসিয়াছে অঙ্কে লয়ে স্বামীর চরণ।

(আলিসার পার্শ্বে।)

রজনী গভীরা অতি, ভীম বেগে বহে প্রভঞ্জন,
নিবিড় জলদ রাশি ঢাকিয়াছে অসীম আকাশ,
ক্ষণে ক্ষণে মেঘমালা করিতেছে বারি-বরষণ,
আঁধার ধরায় কভু ফুটিতেছে বিজলী আভাস।
সৌধ-শিরে শোভাময়ী দাঁড়াইয়া পার্শ্বে আলিসার-
বিরহী যক্ষের চিত্র চিত্তে তার উঠিল ফুটিয়া ;
একটি বৎসর শুধু না হেরিয়া আনন প্রিয়ার
কেমনে বলয় তার হস্ত হতে পড়িল খসিয়া !
হায় রাম-গিরিবাসি ! কত জান বিরহ-বারতা ?
কোন্ ব্যথা অলকায় জানাইল নিজ অভিসার ?
মেঘদূত শুনেছিল কি তোমার হৃদয়ের কথা—
এক বৎসরের দুঃখ কেন এত লভিল প্রসার !
জলদের [illegible]থ করিছে সঞ্চার
অনন্ত বিরহে ভরা অতি ক্ষুদ্র হৃদয় আমার।

(আশাহতা ।)

আশাহত হিয়া মাঝে উঠিল অশান্ত আলোড়ন,
ব্যাকুল হইয়া শোভা দাঁড়াইল প্রাসাদ-শিখরে ;
প্রতীচি আশার কোলে ডুবিয়াছে অরুণ ত[illegible]ন,
কুলায়ে ফিরিছে পাখী গান গেয়ে সুমধুর স্বরে।
কোথা তৃপ্তি ? হায় প্রভু ! জীবনের আনন্দ কোথায় ?
এ কোন্ অনল-শিখা চিত্তমাঝে উঠিল জ্বলিয়া !
দিনান্তের ম্লান রবি ডুবিয়াছে পশ্চিম আশা[illegible],
তবু এ রক্তিম রেখা কেন আছে আকাশে ফুটিয়া ?
বাসনার স্রোতে কেন আবর্ত্তিত মানবের হিয়া !
যা পেয়েছি কেন তার কোন দিন করিনি আদর—
"আরো কিছু পেতে হবে," কেন এই তৃষ্ণায় ভুলিয়া
লক্ষ্য পথে খুঁজিতেছি সাধনার ধন নিরন্তর ?
হায় রমণীর হিয়া, কেন তুমি অসার [illegible]ন !
নয়নে সলিল কেন—মর্ম্মে কেন অনল [illegible]হন ?

*   *   *

কখন ফিরিল স্বামী জানিতে না পারিল [illegible]বতী,
তখনো সে ম্লানমুখে সৌধ-শিরে আছে দাঁড়াইয়া ;
ধারণা-তটিনী-বক্ষে তরঙ্গিত[illegible] লক্ষ স্মৃতি,
তাহাদের অভিঘাতে বক্ষ তার উঠিল কা[illegible]।
সংযত করিবে তারে এত শক্তি কোথায় শোভা[illegible]—
অসীম ধরণী তলে সাথী-হারা [illegible]হ-হারা নারী !
জীবন জুড়িয়া জাগে বেদনার দৃ[illegible]হাহাকার,
প্রেম আর অভিমান এককালে হৃদয়-[illegible]।

প্রহরের পরে যবে অবসিত দ্বিতীয় প্রহর,
চমকি উঠিয়া শোভা ভূমিতলে লুটিল তখন,
অনন্ত আঁধারে ভরা সুবিস্তৃত অসীম অম্বর,
আলোকিত ধরা বক্ষে তমসার একি আয়োজন !
দাঁড়াইয়া শান্ত মুখে হেরিতেছে যামিনী মধুরা,
শীতল কঠিন ভূমে লুটিতেছে বিয়োগ-বিধুরা।

* * *

নিশা অবসান-প্রায়—শোভাময়ী উঠিল বসিয়া,
অবসন্ন দেহলতা—পরিশ্রান্ত হৃদয় তাহার ;
চলিল শয়ন-কক্ষে বহু যত্নে আত্মসম্বরিয়া,
অঞ্চল লুটিছে ভূমে, শিশিরাক্ত মুক্ত কেশ-ভার।

(পীড়িতা।)

সেই সুসজ্জিত ঘর বিশৃঙ্খল হয়েছে এখন,
বিমলিন চিত্রগুলি শোভা পায় কক্ষের প্রাচীরে ;
ধূলি-ধূসরিত শয্যা—পরিধানে মলিন বসন,
বসে আছে শোভাময়ী ম্লানমুখে অবনত শিরে।
চারিদিকে উপাধান, [illegible]ক ঈষৎ হেলিয়া
বসিয়াছে [illegible]ধানে অঙ্গ রক্ষা করি আপনার ;
নিষ্প্রভ নয়ন হতে জলধারা পড়িছে ঝরিয়া,
নিশ্বাস দারুণ ক্লেশ—[illegible]ক্ষ যেন পাষাণের ভার।
বিশুষ্ক রসনা, কণ্ঠ [illegible]দনায় ছিন্নপ্রায় শির,
প্রবল জ্বরে [illegible]গে মুখখানি অরুণ বরণ ;

পারে না বলিতে কথা, দৃষ্টি যেন অবশ, অধীর,
এমন শকতি নাই করিবে যে অঙ্গ-সঞ্চালন।
নিশ্বাস লইতে আর জলবিন্দু গ্রহণ করিতে
শক্তি নাই অভাগীর—আছে শক্তি বাঁচিয়া থাকিতে!

* * *

চাপিয়া চাপিয়া শোভা বহু কষ্টে ফেলিছে নিশ্বাস,
কখনো ব্যজনী লয়ে নাসিকায় করিছে বীজন;
এত বড় বসুমতী—জলে, স্থলে, ভাসিছে বাতাস,
শোভারে সমীর দিতে কেন প্রভু হইলে কৃপণ?
কালিমা-বেষ্টিত আঁখি ঘুম-ঘোরে আসিছে ঢুলিয়া,
কিন্তু তার শক্তি নাই উপাধানে মস্তক রাখিতে;
জ্বর-তপ্ত দেহলতা যাতনায় পড়িছে হেলিয়া,
তথাপি শকতি নাই শয্যাতলে শয়ন করিতে।

* * *

ঘন কৃষ্ণ-মেঘে ভরা আষাঢ়ের ধূসর গগন,
অবিরল বারিধারা ঝরিতেছে বক্ষে ধরণীর;
প্রবল জীমূত-নাদে ক্ষণে ক্ষণে বধির শ্রবণ,
বিপুল সলিল-স্রোতে আবরিত পরিখার তীর।
আবার পীড়িত হয়ে শোভাময়ী লুটিল শয্যায়,
আবার বাড়িল তার নিশ্বাসের প্রবল যাতনা;
বাড়িল অঙ্গের তাপ, হারাইল শক্তি সমুদায়,
নিষ্প্রভ নয়ন-প্রান্তে আসিয়া মিশিল অশ্রুকণা।
লইয়া লেখনী করে ভাবে শোভা "লিখিব কবিতা,"
কাঁপিয়া উঠিল হস্ত, কল্পনায় বিভ্রম ঘটিল;
দূর আকাশের পানে শ্রান্ত মুখে চাহিল ব্যথিতা,
প্রতিহত আশা তার সমীরণে ভাসিয়া চলিল।

আহত হৃদয়ে শোভা লেখনী লইল পুনরায়।
বাহিরে বহিছে যেন প্রলয়ের প্রবল ঝটিকা,
সলিলের আস্তরণে বসুধারে ঢেকেছে আকাশ ;
জলদের অন্তরালে অবলুপ্ত চন্দ্রমা, তারকা,
কেবল তমসা-বক্ষে ফুটিতেছে বিজলী-আভাস।
বাড়িয়া চলিল রাত্রি, ঘনীভূত হইল আঁধার,
হা হা রবে সমীরণ দিকে দিকে চলিল কাঁদিয়া ;
পরিজন পাসরিল বাতি দিতে প্রকোষ্ঠে শোভার,
একেলা আঁধার ঘরে বাক্যহীনা রহিল বসিয়া।
সহসা ভীষণ শব্দে কোথা যেন অশনি পড়িল,
সভয়ে কাঁপিয়া শোভা দুই হাতে হৃদয় চাপিল।

* * *

গভীর নিশীথে শোভা ঘুম-ঘোরে পড়িল ঢলিয়া,
নিশ্বাসের ক্লেশ তারে অমনি করিল সচেতন ;
আবেশ-বিহ্বল চোখে চমকিয়া দেখিল চাহিয়া,
শত বিভীষিকা যেন কক্ষ মাঝে করিছে ভ্রমণ !
ঘটিল স্মৃতির [illegible]—মনে হল দাঁড়ায়ে অদূরে
কে যেন উ[illegible]লে চোখে হেরিতেছে আনন তাহার ;
কাঁপিয়া উ[illegible]য়া শোভা কি যেন বলিল শ্রান্ত স্বরে,
শুনিয়া আ[illegible]ন কণ্ঠ তখনি সে কাঁপিল আবার।
রজনীর [illegible]বসানে অতি ধীরে নিশ্বাস ছাড়িয়া
চাহিয়া [illegible]হিল শোভা প[illegible]বর বাতায়ন-পথে,
পরিখ[illegible] [illegible] বক্ষে চলিয়াছে তরণী বহিয়া,
রাজ[illegible] আবরিত বরষার সলিলের স্রোতে।
উপরে গগন তলে ত[illegible] ও ঝরিছে সলিল,
ত[illegible]

* *

(ব্যথিতা।)

যুক্তকরে শোভাময়ী চাহি দূর আকাশের পানে
বলিল, "সহিব আমি—কত ব্যথা দিবে বিশ্বনাথ ?
পাষাণ প্রতিমা নই, ধারণার শক্তি আছে মনে,
নীরবে সহিব আমি জগতের দুঃখ-অভিঘাত।
অসীম অদৃষ্ট-পথে অশ্রু শুধু পাথেয় আমার,
শক্তিহারা নারী আমি তাই লয়ে চলেছি একেলা ;
আশ্রয়ের আশা প্রভু স্নেহভরা আশীষ তোমার,
তোমার পবিত্র স্মৃতি এ জীবনে আনন্দের মেলা।
দাও দুঃখ, দাও ব্যথা, নত শিরে ল'ব আমি নাথ,
ধরণীর ধূলি শোভা—সহিবে সে দারুণ আঘাত।"

* * *

গুমরি উঠিছে হিয়া, বহে প্রাণে ঝটিকা প্রবল,
নিয়তির পরিহাসে আশাহত জীবন তাহার ;
বিরলে বসিয়া কভু অবিরত ঢালে অশ্রুজল,
কখনো মলিন মুখে ঊর্দ্ধ পানে চাহে বার বার।
সম্মুখে পড়িয়া আছে অদৃষ্টের মহা মরুভূমি—
সভয়ে লুকায় শোভা কল্পনার অন্ধকার ঘরে,
বহিছে বিষাদ-নদী ধারণা-সৈকত প্রান্ত চুমি ;
সর্ব্ব অনুভূতি শোভা লুকাইল আ[illegible]া।
একেলা বসিয়া ঘরে জগতের দৃষ্টি-অন্তরালে,
ভুলিতে চাহিল শোভা হৃদয়ের লালসা, কামনা।
ভাবিল, "হব না বন্দী আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম তন্তু-জালে,
বিজনে বসিয়া আমি প্রণয়ের করি সাধনা।"

জানিত না শোভাময়ী কত ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার,
জানিত না বক্ষে তার "আমিত্বে"র কেমন প্রসার !

* * *

কেটে গেল মধুমাস—মাধবের পরশ লভিয়া
কুসুম-কুন্তলা ধরা তপস্বিনী সাজিল যৌবনে ;
প্রতপ্ত ভূমির বুকে কিশলয় লুটিল কাঁদিয়া,
ধ্বনিল উদাস-গাথা বিহঙ্গের মধুর কূজনে।
চাহিয়া দেখিল শোভা দাঁড়াইয়া জানালার ধারে,
পরিখার দুই তীরে রৌদ্র-সিন্ধু তুলিছে হিল্লোল ;
কোকিল আকুল হয়ে গান গাহে নারিকেল-শিরে,
সমীর বহিয়া যায় চারিদিকে ঢালিয়া অনল।
শ্রান্ত হয়ে বসুন্ধরা চেয়ে আছে আকাশের পানে,
প্রকৃতি উদাস চোখে হেরিতেছে বিশ্ব-দেবতায় ;
রৌদ্র-তপ্ত প্রান্তরের বক্ষে যেন অতি সঙ্গোপনে
ভ্রমিতেছে মরীচিকা লুকাইয়া আপনার কায়।
যেন বিষাদের ছবি—যেন কোন্ ব্যথাতুর প্রাণ
আকাশ পাতালে ভ্রমি' খুঁজিতেছে আপনার স্থান।

আবার আসিল রাত্রি—আশাতুর কম্পিত হৃদয়ে
আসিয়া পশিল শোভা আপনার শয়ন-আগারে ;
শূন্য শয্যা পড়ে আছে—সমীরণ আকুলিত হয়ে
শয্যার উত্তরচ্ছদে ক্ষণে ক্ষণে লুটাইয়া পড়ে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক হৃদয়ের অন্তস্তল হতে
সহসা বাহির হয়ে মিশে গেল বক্ষে ধরণীর ;
মলিন আননে শোভা দাঁড়াইয়া বাতায়ন-পথে
দেখিল আকুল স্রোতে বয়ে যায় পরিখার নীর।

দেখিল মেঘের বুকে আঁকা আছে ছবি বেদনার,
ধরণীর ম্লানমুখ হেরিতেছে আকাশের তারা,
প্রতি তরুশিরে জাগে সকরুণ দৃপ্ত হাহাকার—
সহসা শোভার গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল অশ্রুধারা।
"ওগো চির প্রিয়তম, ক্ষণিকের অতিথি আমার!
তোমারি উদ্দেশে আজি গাঁথিলাম অশ্রু-মুক্তাহার।"

*　　　*　　　*

ছোট ছোট কথা লয়ে সংসারের পরিজনগণ
বিশীর্ণ করিল তারে অশান্তির অনল জ্বালিয়া;
কেন্দ্র যেন শোভাময়ী—চিন্তা, ভয়, দুঃখ অনুক্ষণ
প্রদক্ষিণ করি' তারে ভ্রমিতেছে আপনা ভুলিয়া।
ব্যথিত হইয়া শোভা গৃহ-কোন্ করিল আশ্রয়,
পুস্তক-বারিধি গর্ভে হারাইল সত্তা আপনার;
বুঝিতে পারে না কিছু, তবু তার উৎসুখ হৃদয়,
তবু সে পড়িয়া যায় অফুরন্ত গ্রন্থ অনিবার।
প্রকৃতির পরিহাসে এই সুখ অবসানে হায়,
পীড়িত হইল আঁখি, ক্রমে ক্রমে পরিশ্রান্ত শির,
এক দণ্ড গ্রন্থ পড়ি' সারাদিন মরে যাতনায়,
নিয়তি হৃদয়ে তার ঢেলে দিল বেদনা গভীর।
যুক্ত করে শোভাময়ী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল,
রুদ্ধ অভিমানে তার ক্ষুদ্র হিয়া ফুলিয়া উঠিল।

*　　　*　　　*

অধিরোহণীর প্রান্তে শোভাময়ী বসিল আসি
হস্তে সীবনের সাজ, লক্ষ্যহারা নয়ন তাহার,
সন্ধ্যার সুবর্ণ-জ্যোতিঃ চোখে মুখে পড়িছে লুটিয়া,
হৃদয়ের পটে ভাসে অর্দ্ধস্ফুট চিত্র নিরাশার।

এই জীবনের সুখ ? সময়ের চক্র-আবর্ত্তনে—
হে দেব ! কিসের আশে ভ্রমিতেছে মানব-জীবন ?
কোথায় তৃষ্ণার জল ? বল প্রভু, কোন্ আকর্ষণে
নিয়তির মুখ চেয়ে আমাদের ব্যাকুলিত মন !
রৌদ্র-জাতা মরীচিকা ভ্রমে যথা ঊষর ধরায়,
তেমনি কি আমাদের বক্ষে ভ্রমে ধারণা, কল্পনা ?
জীবনের অবসানে—বিস্মৃতির আঁধার ছায়ায়
একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে কি এ অসীম চেতনা ?
সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্ন—কে যেন অদূরে গান গায়,
"সুখে রাখ দুখে রাখ (দয়াময়) যে বিধান হয়।"

তাই কর [illegible]নাথ ! যা তোমার হৃদয়-বাসনা,
ধৈর্য্যহীনা শো[illegible]াময়ী অনুযোগ করিবে না আর ;
শুধু সে মানিয়া যাবে তুমি তার আশা ও কামনা,
স্নেহের আশ্রয়ে তব ভুলিবে সে চেতনা ধরার।
শুধু প্রভু যুক্তকরে উন্মাদিনী চাহে এই বর,
হৃদয় না হয় যেন শীতান্তের কানন সমান ;
পাণ্ডুর পল্লব-পুঞ্জে শ্যামতার জ্যোতিঃ নিরন্তর
পুলকে ফুটিয়া যেন উজলিত করে মনঃ প্রাণ।
ঊর্দ্ধে ওই সীমাশূন্য মহাব্যোম-পারাবার মাঝে
যে মহা[illegible]তের সুর অনুরণি' ভ্রমিছে কেবল—
সেই মূর্চ্ছনার ধ্বনি যেন তার বক্ষে আসি বাজে,
স্বার্থ[illegible]র্শ দূর হয় লয়ে নিজ তপ্ত অশ্রুজল।
হে মহান্ ! হে শোভন ! তুমি এই জগতের সার,
তোমার চরণ হোক বিষাদের সান্ত্বনা আমার।

*　　　　*　　　　*

ভার্ণ

ক্ষণে ক্ষণে সন্ধ্যা তারা কাঁপিতেছে অসীম অম্বরে,
অঙ্গের মাধুরী তার ধরাতলে লুটিছে আসিয়া ;
পুস্তক লইয়া শোভা ভ্রমিতেছে প্রাসাদ-শিখরে,
সীমাহারা চিন্তারাজ্যে অনুভূতি উঠিল জাগিয়া।
কোথায় ঘটেছে ভুল—হৃদয়ে, অথবা ধারণায় ?
মন বলে, "পাই নাই"—স্মৃতি বলে, "পেয়েছি তাঁহারে,'
চির ভাগ্যবতী শোভা ! দুঃখিনী ভাবিয়া আপনায়
বিমজ্জিত হও কেন নিরাশার অকূল পাথারে ?

* * *

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভূমিতলে বসিয়া থাকিয়া
ভ্রমিতে লাগিল শোভা ম্লান মুখে প্রাসাদ-শিখরে ;
অনল-প্রতিমা ধরা—নাই হেথা প্রণয়-অমিয়া,
ফোটেনা স্নেহের ফুল মানবের পাষাণ অন্তরে।
পীড়ায় কাতর দেহ, হৃদয়ের এত গুরু ভার
কেমনে বহিব আমি বল আজি করুণানিলয় !
তুমি জান কেহ নাই মুখপানে চাহিতে আমার,
জান তুমি কি আঘাতে শত চূর্ণ এ ক্ষুদ্র হৃদয়।
ধরার বিশাল বক্ষে তুচ্ছতম আমার জীবন,
আমারে লইয়া কেন মাতিয়াছ তাণ্ডব-লীলায় !
কেন এ পরীক্ষা প্রভু ? বিশ্বে কেন আমার এমন !
হীনতার পঙ্কে নাথ কেন তুমি ডুবালে আমায় ?
ভাবিতে ভাবিতে শোভা পাসরিল মুরতি ধরার,
দেখিল সম্মুখে তার বিরাজিত অনন্ত আঁধার।

* * *

উপবাসে, অনিদ্রায়, দীর্ঘতর রোগ-যাতনায়,
মানসিক ক্লেশে শোভা ক্রমে যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া।

সুদর্শন চক্র দিয়া সতী-অঙ্গ কাটিলা কেশব,
সসম্ভ্রমে বসুন্ধরা শঙ্করীরে হৃদয়ে ধরিল ;
দেবীর পবিত্র বক্ষ—রাজে যথা অমরা-গৌরব,
সেই হিয়া বক্ষে ধরি দেওঘর কৃতার্থ হইল।
পতিব্রতা-স্পর্শ-পূত ভূমি-রজঃ ধরিয়া মাথায়
অশ্রুপ্লুত নেত্রে শোভা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়ায়।

*　　*　　*

হে দেবী মঙ্গলময়ী, ওগো দেব জগৎ জীবন,
সান্ত্বনা-সলিল ঢালো দাব-দগ্ধ হৃদয়ে আমার,
এসেছি চরণতলে শিবশক্তি করিয়া স্মরণ,
সফলিত কর আজি হৃদয়ের বিষাদ-সম্ভার,
জীবনের পথে মম পরিপূর্ণ একুশ বৎসর,
সাধ্যমত সহিয়াছি ধরণীর কল-কোলাহল ;
আজি আমি পরিশ্রান্ত—সংসার কারায় নিরন্তর
আঁধারে থাকিয়া বন্দী আজি মোর অন্তর বিকল।
কর আশীর্ব্বাদ মাগো, ধৈর্য্য দাও অসংযত বুকে,
আমারে বলিয়া দাও কি আমার জীবনের কাজ,
স্বাস্থ্য নাই, শক্তি নাই, দিবানিশি আছি ম্লানমুখে,
বেদনা ঘুচিয়া যাবে বল দেবী! কোন্ পথে আজ।
লক্ষ্যহারা হয়ে ভ্রমি নিশাচরী প্রেতিনী সমান,
বল মাগো, কি করিলে শান্ত হবে অভিশপ্ত প্রাণ।

*　　*　　*

পড়ে আছে শিলারাশি, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর,
অস্তগামী রবি-করে জ্বলিতেছে দারোয়ার জল,
সুদূরে নন্দন গিরি, শিরে শোভে মন্দির সুন্দর,
ঢালিয়া শ্যামল শোভা হাসিতেছে কিশলয় দল।

দূরে দূরে গিরিশ্রেণী, মেঘমালা পিছনে তাহার,
সন্ধ্যার ধূসর রাগে নীলাকাশ হয়েছে রঞ্জিত,
বন-পুষ্প-রেণ বহি' ঢালে বায়ু সুরভি-সম্ভার ;
দিক্-চক্রবাল যেন ক্রমে হয় স্বপনে মণ্ডিত।

* * *

চাহিয়া চাহিয়া শোভা মুগ্ধ কণ্ঠে কহিল হাসিয়া,
"দেবতা সুন্দর, তাই বিশ্ব গেছে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া।"

* * *

দেবীর মন্দির প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া
যুক্তকরে শোভাময়ী মনে মনে করে উচ্চারণ,
"কোন্ শক্তি বলে মাগো স্বামী নিন্দা শ্রবণে শুনিয়া
নিন্দাকারী-গৃহে দেহ সেইক্ষণে দিলে বিসর্জ্জন ?
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি, বক্ষে নাই শক্তি-অনুরতি,
আমারে করুণা কর স্নেহময়ী ত্রিলোক-পালিনী,
যে শক্তি থাকিলে বুকে স্বামী হয় রমণীর গতি,
সে শক্তি আমারে দাও, দেখ আমি বড় অভাগিনী।
তুমি জান, মনে নাই কভু তাঁর কাজের বিচার,
কেন তবে বক্ষে আজ করিতেছ 'আমিত্ব' সঞ্চার ?"

(শোক।)

বিগত একটি বর্ষ সীমাহারা সময়-সাগরে
একটি তরঙ্গ যেন হারাইল সত্তা আপনার ;
আছে সেই গৃহখানি, সেই মত প্রতি ঘরে ঘরে
সেই প্রাণীগুলি আছে সুখ-দুঃখ লয়ে যে যাহার

শুধু সে আলয়ে নাই অতীতের সেই চারু হাসি,
নাই সেই সরলতা, নাই সেই প্রিয় ব্যবহার ;
কামনা করিতে হয় তাই আছে আশা রাশি রাশি,
বিষাদ করিতে হয় আছে তাই নয়ন আসার।
যেন কোন্ নিশাকর হরিয়াছে সবাকার প্রাণ,
মৃত দেহগুলি তাই ইতস্ততঃ রয়েছে পড়িয়া ;
ভুলিয়াছে ভালবাসা—ভুলিয়াছে হৃদয়ের গান,
জীবন ধরিতে হয়, আছে তাই সকলে বাঁচিয়া !
নীরবে যামিনী আসে, নীরবেই আসে দিনমান,
শুধু সে সংসারে নাই আনন্দের আদান প্রদান !

* * *

চৈত্রের প্রতপ্ত দিবা—বহিতেছে আকুল সমীর,
নারিকেল পাতাগুলি রবি-করে উঠিছে জ্বলিয়া ;
তপন-পরশ পেয়ে হাসিতেছে পরিখার নীর,
হিল্লোলিত বক্ষে তার চলিয়াছে তরণী ভাসিয়া।
বসিয়া শয়ন কক্ষে শোভাময়ী করিছে সীবন,
কুসুম কলিকা সম শিশু এক উৎসঙ্গে তাহার ;
ব্যজনী লইয়া করে ক্ষণে ক্ষণে করিছে বীজন,
কখনো আনত হয়ে চুমিতেছে ওষ্ঠে দুহিতার।
ক্ষুদ্রতমা শিশু কন্যা—জনকের পূর্ণ প্রতিকৃতি—
জননীর প্রতিবিম্ব পড়ে নাই আননে তাহার ;
চেয়ে তার মুখপানে পুলকিত হইয়া যুবতী,
হেরিছে ধরায় কিবা অমরার সুষমা-সম্ভার।
ধূসরিত মরু শোভা, তার কোলে স্বরগের ফুল !
স্বপনের চিত্র ইহা, অথবা ঐ [illegible]াতার ভুল ?

* * *

নেমে আসে সন্ধ্যারাণী শিথিলিত আঁচল টানিয়া,
আবেশ মাধুরী মাখা সকরুণ মূরতি তাহার ;
আত্মহারা শোভাময়ী বাতায়নে আছে দাঁড়াইয়া,
ধ্বনিছে শ্রবণে তার প্রকৃতির বিষাদ-ঝঙ্কার।
ওই দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা—না না, ইহা ভ্রান্তি আমাদের,
ভাবুক বলেন, "সন্ধ্যা প্রভাতের অন্য রূপান্তর,"
সন্ধ্যা নয়—ঊষা ওই, ঠিক যেন চিত্র বিষাদের !
প্রতিভাত মুখ-পদ্মে দিবসের নিয়তি কঠোর।
আকাশের বক্ষে ভাসে এলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশি,
নয়নের শান্ত দৃষ্টি শান্তি ঢালে বক্ষে অবনীর ;
ভাসে না আননে আর প্রভাতের সমুজ্জ্বল হাসি,
চারিদিকে অবসাদ—চারিদিকে নিবিড় তিমির !
জীবনের অবশেষে সত্য ভাষে সম্মুখে ঊষার,
"সাহানা কিছুই নয়—পূরবী-ই জীবনের সার।"

* * *

দূরে—দিক্-চক্রবালে মিশে গেল সন্ধ্যার রক্তিমা,
বিস্ময়-বিমূঢ়া শোভা ক্ষণপরে ফিরাইল আঁখি ;
তমসার অন্তরালে আছে কি এ বিষাদের সীমা ?
প্রকৃতি আনন্দ-উৎস সঙ্গোপনে রেখেছে কি ঢাকি
জলদের স্তরে স্তরে—ধরিত্রীর সীমান্ত-রেখায় ?
সৃষ্টির প্রথম হতে জগতের বিলয় অবধি
এই আনন্দের ধারা দিবা নিশি প্লাবিয়া ধরায়
পরিশেষে লভিবে কি আমাদের জ্ঞানাতীত গতি ?

* * *

ভাগ্য লিপি ! হায় দেব, ভাগ্য লিপি কে মুছিতে পারে ?
কেন এই সেবা, যত্ন—কেন এই আত্ম-প্রতারণা ?

নিয়ন্ত্রিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোথায় সংসারে—
প্রকৃতি কাহার ঘরে করে নাই বিষাদ-ঘোষণা ?
মৃত্যু-কবলিত শিশু, শান্ত চক্ষে হেরিল জননী,
উচ্ছ্বসি উঠিল হিয়া, কিন্তু কিছু নাহি বলিবার !
জীবন-যাত্রায় তার নীরবতা মঙ্গল শরণী,
তাই লয়ে উত্তরিবে অন্তহীন অশ্রু-পারাবার।
আত্মীয় আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল প্রসারিত করে,
নীরবে উঠিল শোভা শিশুটিরে রাখিয়া শয্যায়,
শেষ বার চেয়ে দেখে উদ্বেলিত আকুল অন্তরে,
নন্দিনী রহিল তার হৃদয়ের স্মৃতি-সীমানায়।
দাঁড়াইল শোভাময়ী—চিত্র যেন আত্ম-বিস্মৃতার !
অন্তরে ঝটিকা বহে, বহিঃ শান্ত হৃদয় তাহার।

* * *

ঝিল্লী-মুখরিত নিশা, অবসিত প্রথম প্রহর,
নিবিড় নীরদ মালা শোভা পায় পূরব গগনে,
জলদের অন্তরালে চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ক্ষীণতর—
পরিশ্রান্ত সমীরণ ধীরে ধীরে বহে ক্ষণে ক্ষণে।
শূন্য মনে দাঁড়াইয়া আছে শোভা আলিসার ধারে,
লক্ষ্যহারা দৃষ্টি তার একদিকে রয়েছে পড়িয়া,
অর্দ্ধ-আবরিত দেহ ঘন-কৃষ্ণ চিকুর-সম্ভারে,
আষাঢ়ের মেঘমালা চক্ষে যেন আসে ঘনাইয়া।
বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া স্পন্দমান হইল চরণ,
সহসা চকিত হয়ে শোভাময়ী দৃষ্টি ফিরাইল,
শ্রবণে ধ্বনিল আসি ক্ষীণতম করুণ ক্রন্দন,
"ওই বুঝি কাঁদে খুকী" ভাবি বাস কাঁপিয়া উঠিল

কোথা সেই ক্ষুদ্র শিশু—কোথা তার বিষাদিনী মাতা,
রজনি ! তোমারি বুকে মিশে থাক্ হৃদয়ের ব্যথা।

(সমবেদনা)

অগ্রজা দুহিতা হারা, আভাময়ী সংবাদ পাইয়া
লিখিল সান্ত্বনা-লিপি জুড়াইতে ভগিনীর প্রাণ,
চারি পৃষ্ঠা চিঠীখানি—পড়ে নাই অশ্রু উছলিয়া,
ছিল না সে পত্রিকায় উচ্ছ্বাসের ব্যর্থ অভিযান।
লেখা ছিল—"দিদি তুমি ডুবিও না নিরাশা সাগরে,
আঁকিয়া শোকের ছবি হারায়োনা শক্তি আপনার ;
'গতিশীল সুখ দুঃখ' এই কথা ভাবিয়া অন্তরে,
পার যদি কোরো ভাই দেবতার কাজের বিচার।
স্নেহ—প্রীতি—সহিষ্ণুতা—হৃদয়ের মৌন হাহাকার—
শূন্যতার পদতলে চিরতরে আত্ম-বিসর্জ্জন—
জানি আমি চরিত্রের বিশেষত্ব ইহাই তোমার ;
তাই বলি, আপনারে কর ভাই আত্ম-সমর্পণ।
একবার ভেবে দেখো জগতের প্রকৃতি কেমন,
তা হলে বুঝিবে তুমি কারে বলে জীবন, মরণ।"

* * *

আশা নাই, তৃপ্তি নাই, কোলে নাই স্নেহের দুহিতা,
নিঃসঙ্গ হৃদয়ে শুধু উচ্ছ্বসিত উৎস বেদনার ;
জীবন-সংগ্রামে আজি শোভাময়ী হইল বিজিতা,
দীর্ঘ পথে চলিবার নাই কিছু পাথেয় তাহার।

যে দুঃখের অভিঘাতে বক্ষ তার পড়িল ভাঙ্গিয়া,
পড়িল তাহার ছায়া বিমলের হৃদয়-দর্পণে ;
সম-বেদনার স্পর্শে বনিতার হৃদয় প্লাবিয়া
শান্ত কণ্ঠে বলে স্বামী—"কাজ নাই বিফল রোদনে
তোমারে সাজেনা শোভা জগতের শোক, মলিনতা,
অন্তরে বুঝেছি আমি কত ঊর্দ্ধে তব পবিত্রতা।"

* * *

(নৈরাশ্য)

ঊর্দ্ধে ওই নীলাকাশ, নিম্নে এই বিশাল ধরণী,
উভয়েরে আবেষ্টিয়া সমীরণ বহে অবিরত ;
প্রতিদিন হাসে ঊষা—প্রতিদিন আসিছে রজনী,
চক্রাকারে সুখ-দুঃখ মহাশূন্যে ভ্রমিছে নিয়ত।
অনন্ত সময়-সিন্ধু আলোড়িয়া হৃদয় ভাণ্ডার
অসংখ্য জীবন-ঊর্ম্মি করিতেছে ভীম গরজন ;
এই ডোবে—এই ভাসে—এই করে আপনা প্রসার,
কাল-সাগরের বক্ষে চৈতন্যের মহা আন্দোলন !
আশা, হাসি, অভিলাষ, অশ্রু আর আসক্তি, বিরতি,
জীবনের চারি পাশে ভ্রমিতেছে হইয়া আকুল ;
কে জানে আরম্ভ কোথা—কত দূরে শেষ পরিণতি—
কোথায় ঘুচিয়া যাবে মানবের হৃদয়ের ভুল !
কত লক্ষ বসুন্ধরা মহাশূন্যে ...ন আবর্ত্তন,
কোথায় ইহার মাঝে নিরাশার আকুল ক্রন্দন।

.ই প্রবাহের মাঝে—এই দৃপ্ত স্পন্দনের বুকে।
রিয়া কেমন বেশ আছ তুমি জগৎ জীবন ?
বিস্তৃত বিশ্বরাজ্য চলিয়াছে তব অভিমুখে,
তামারি চরণ তলে ভ্রমিতেছে চন্দ্রমা, তপন।
দবানিশি সমীরণ প্রদক্ষিণ করিছে তোমায়,
প্রকৃতি চরণ তলে ঢালিতেছে চিত্ত-অর্ঘ্যভার ;
তরঙ্গিত ব্যোমরাশি উদ্ভাসিয়া কোটি বাসনায়
তামারি মহিমা-স্রোতে আপনারে করে সম্প্রসার।
র্ণর ধূলি শোভা—তুচ্ছতম হৃদয় তাহার,
দীনতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ এইমাত্র তাহার সম্বল,
লিন হৃদয়ে তার প্রতিবিম্ব পড়েনি তোমার,
তাই সে ঢালিছে বৃথা নয়নের তপ্ত অশ্রুজল।
বিশ্ব-প্রকাশক প্রভু, আপনারে প্রকাশ করিয়া
চিন্তার কালিমা তার স্নেহভরে দাও মুছাইয়া

*　　　*　　　*

আবার কাটিল বর্ষ—ভাদ্র মাস ফিরিল আবার,
দিন-লিপি ব .র লয়ে শোভাময়ী পড়িছে বসিয়া ;
বহুশত ঘটনায় পরিপূর্ণ জীবন তাহার,
বলিলে বেদনা বাড়ে—তাই তাহা রাখেনি লিখিয়া।
কাগজে লেখেনি শোভা, কিন্তু তার হৃদয়-ফলকে
সেই নিদারুণ স্মৃতি টানিয়াছে বিদারণ-রেখা ;
অভিমান-অশ্রু-উৎস উছলিয়া ঝলকে ঝলকে
আশা-চিত্রপটে তার ঢালিয়াছে অন্ধকার লেখা।
কল্পনার ছায়া নয়—নয় ইহা কবিত্ব ঝঙ্কার,
বেদনার রক্ত-রাগে এই স্মৃতি চির সমুজ্জ্বল ;
শ্মশান-বহ্নির বুকে আছে শুধু সান্ত্বনা শোভার,

সেদিন মুছিয়া যাবে নয়নের তপ্ত অশ্রুজল।
সে দিন ভুলিবে শোভা সংসারের অজস্র পীড়ন,
জীবনের যজ্ঞে বুঝি পূর্ণাহুতি পড়িবে তখন !

*　*　*

আর কত দেরী তার ? শোভা আর পারে না সহিতে,
আঘাতে আঘাতে আজি শতচূর্ণ হৃদয় তাহার ;
শূন্যতার গুরুভার আর শোভা পারে না বহিতে,
চাপিতে পারে না বুকে হতাশার মৌন হাহাকার।
ক্ষণে ক্ষণে সাধ হয় আলিসার উপরে ঝুঁকিয়া
পড়িয়া সরণী-বক্ষে করিবে দুঃখের অবসান :
অমনি স্বামীর চিত্র চিত্ত-পটে ওঠে বিভাসিয়া,
শ্রবণে ভাসিয়া আসে দুহিতার ক্রন্দনের তান।
কামনা ব্যাকুল হয়, দৃষ্টি হয় নিরাশা-কাতর,
হৃদয়ে বহিয়া যায় প্রলয়ের প্রবল ঝটিকা,
শূন্য চোখে চেয়ে থাকে ; শ্রান্ত আঁখি—অবশ অন্তর ;
জাগিয়া স্বপন দেখে, চারিদিকে দেখে বিভীষিকা।
ডুবেছে নিরাশা-গর্ভে আনন্দের প্রতিমা তাহার,
জীবনে সপ্তমী তিথি কোন দিন ফিরিবে কি আর ?

(মহাপূর্ণতার দিকে)

কার্ত্তিকের অপরাহ্ন ; রক্তরাগে রঞ্জিত ধরণী,
প্রতীচি আশার কোলে ঢলিতেছে আরক্ত হিরণ,
পূর্ব্ব-দিক্ চক্রবালে ধীরে ধীরে নামিছে রজনী,
শন্ শন্ মৃদুস্বনে বহিতেছে সান্ধ্য-সমীরণ।

.সিত মহাশূ... অস্তমান তপনের করে,
দূরে দূরে সৌধ-শিরে প্রতিবিম্ব পড়েছে তাহার ;
আনন্দে গাহিয়া গান, পাখীগুলি ফিরে যায় ঘরে,
আকাশে বাতাসে ভাসে সুমধুর কলরব তার।
কাঁপিতেছে তরু শির সমীরের মৃদু সঞ্চালনে,
পরিখার শান্ত বক্ষে ধীরে ধীরে তরী চলে যায় ;
আসিয়া দাঁড়া'ল শোভা শান্ত মুখে আলিসার কোণে,
...য়ের একাগ্রতা নিপতিত পশ্চিম আশায়,
...তার দিকে অগ্রসর হইল ভাস্কর,
আমা... জীবনে আজ পরিপূর্ণ তেইশ বৎসর !"

*

শিশুর মধুর কণ্ঠে ফুটিয়াছে অস্ফুট কাকলী,
আনন্দে অধীর হ'য়ে জননী তা শুনিছে বসিয়া,
স্নেহ-স্মিত মুখে শোভা ক্ষণে ক্ষণে দেয় করতালি,
"তাই তাই" বলি শিশু উচ্চ কণ্ঠে উঠিছে হাসিয়া।
খুকুরাণি ! মা আমার, তুমি যে মা স্বরগের ফুল !"
বলিয়া হাসিয়া শোভা অঙ্কে তারে লইল তুলিয়া,
"আমার জীবনে তুমি অমরার বিভব অতুল,
ধরণী সুষমাময়ী—তোর ক্ষুদ্র আনন হেরিয়া।"

*

গভীর নিশীথে শোভা গৃহ-শিরে বসিল আসিয়া,
বিষাদ-পাণ্ডুরমুখী, পৃষ্ঠে শোভে রুক্ষ কেশভার ;
দূর আকাশের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া
মুক্তকণ্ঠে প্রকাশিল হৃদয়ের বাণী আপনার।
"প্রতি দিবসের এই তুচ্ছতম শুষ্ক-আলোচনা
ক্ষণেকের তরে আজ ভুলাইয়া দাও বিশ্বনাথ !

বিস্মৃতি সাগরে দেব ডুবে যাক্ ধারণা, কল্পনা,
হৃদয় ভুলিয়া যাক্ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত।
শুধু আমি সকাতরে যুক্তকরে চাহি এই বর,
আমার স্বামীর স্মৃতি হয় যেন সর্ব্ব সত্তাময় ;
জীবন-মরণ আর জন্মান্তর—যুগ-যুগান্তর—
শক্তি যেন নাহি লভে সেই স্মৃতি করিতে বিলয়।
যে দেশে সাবিত্রী, সীতা—সেই দেশে জনম আমার,
আমারে বিধ্বস্ত করে এত শক্তি কোথায় কাহার!

* * *

হে প্রকৃতি! ক্ষণতরে ঘুচাইয়া দাও আকুলতা,
আজি বুঝাইয়া দাও জীবনের রহস্য কেমন!
কেন জগতের বুকে জাগে এত সীমাহীন ব্যথা—
মসী কলঙ্কিত কেন মানবের পবিত্র জীবন?
ভ্রান্তির কুহেলি-পট একবার কর উত্তোলন,
আমারে দেখিতে দাও কামনার নিবাস কোথায়,
এত সাধ—অভিলাষ, এত আশা—এত আকিঞ্চন—
কেমনে জাগিয়া উঠি মিশে যায় জল-বিম্ব প্রায়?
এই ছায়া—এই তৃষ্ণা আমরা কি রচনা করিয়া
আপনারে ভুলাইতে উপভোগ করি নিরন্তর?
তোমার অদৃশ্য করে জীবনের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া
কামনার বক্ষে হেরি তৃপ্তি-মাখা প্রীতি অনশ্বর?
অনাবৃত মুখে দেবী ক্ষণকাল দাঁড়াও সম্মুখে,
হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখিব পরম কৌতুকে!

* * *

(স্বামীর অনুরোধে।)

"আমার বাসনা এই লেখ তুমি জীবনী তোমার,
অতীতে ও বর্ত্তমানে যে স্মৃতিতে হয়েছ বিকল,
ভবিষ্যতে সেই স্মৃতি জাগাইবে সান্ত্বনা অপার।"

* * *

জীবনের ইতিহাস! সে ত নয় দু'চারিটি কথা,
কেমনে লিখিবে শোভা—শিক্ষা, শক্তি কোথায় তাহার?
লেখনীর মুখে শুধু ঝরিবে চিন্তার আবিলতা,
ভাষায় অস্ফুট হবে হৃদয়ের আবর্জ্জনা-ভার।
চতুর্ব্বিংশ বৎসরের সুখ, দুঃখ, আশা, অভিলাষ,
তরঙ্গিত ব্যোম-বক্ষে উঠিছে ভাসিয়া,
কল্পনার শক্তি নাই ফুটাইতে তাহার আভাষ,
পল্বল কি পারে বক্ষে মহাকাশে রাখিতে ধরিয়া?
হৃদয় সমুদ্র আজি বিমথিত স্মৃতি-আলোড়নে,
নয়নে ভাসিয়া যায় কামনার অভিনব স্তর—
বিরলে বসিয়া শোভা কত কথা ভাবে মনে মনে,
সাধ্যমত লিখে যায়—কিন্তু তার ব্যথিত অন্তর।
স্মৃতি-চিত্রপটে যারা বর্ণ-রেখা করেছিল দান,
লেখনীর মুখে এসে আজি তারা হারাইল প্রাণ।

* * *

যে ছবি ডুবিয়া গেছে অতীতের তমসা ধারায়
কেমনে তাহারে আজ শোভাময়ী করিবে স্মরণ?
আবেশ-বিহ্বলা তৃষা আকুলিয়া উঠিছে হিয়ায়,
কল্পনা করিতে চায় আপনার মৃত্যু-আয়োজন।

ভেবেছিল শোভাময়ী—"যবনিকা গিয়াছে পড়িয়া,
আর বুঝি এ জীবনে এ ছবির নাহি প্রয়োজন ;
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মাঝে আমিত্বের স্মৃতি জাগাইয়া
স্বার্থের অনলে কেন আপনারে দহিব এখন ?
বিস্মৃতির অঙ্কগত হয়ে থাক্ ধারণা, কল্পনা,
হৃদয় ভুলিয়া যাক্ অতীতের করুণ কাহিণী ;
নিবে যাক্ দীপ-শিখা—লুপ্ত হোক্ অনন্ত চেতনা,
আঁধার ভবিষ্য-পথে নীরবে চলিব একাকিনী।"
জানিত না শোভাময়ী প্রতিক্রিয়া আছে প্রকৃতির
এখন হৃদয়ে তাই জেগে ওঠে নৈরাশ্য গভীর।

*

বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম পরিম্লান কল্পনা তাহার,
ক্ষণ পরে ভাবে শোভা, সাধ্যমত করিব বর্জ্জন,
যতটুকু না লিখিলে ফুটিবে না কাহিনী আমার,
স্মৃতির কানন হতে ততটুকু করিব চয়ন।
বাকী যা তা পড়ে থাক্ হৃদয়ের অবরুদ্ধ ভাষা,
সুখ-শান্তি বিসর্জ্জিয়া সময়ের পরিপূর্ণ স্রোতে,
চাহিয়া দেখিব আমি কত তুচ্ছ আনন্দের আশা !
যে বীণা বাজিয়া গেছে চিরদিন অনাহত সুরে,
অতি দূরে মহাকাশে ভেসে যায় মূর্চ্ছনা তাহার ;
সে সুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া চিত্ত-অন্তঃপুরে
লেখনীর মুখে আমি ফুটাইব বেদনা আমার।
কল্পনার চিত্র নয়, নহে ইহা নিশার স্বপন,
বাস্তবের প্রতিলিপি—এ আমার স্মৃতির ক্রন্দন !

* * *

বলিবার কিছু নাই—আজি কিছু নাহি লিখিবার-
কল্পনার তুলিকায় করি নাই আলেখ্য অঙ্কণ ;

লিখিতে পারি না আর জীবনের কাহিনী আমার,
শক্তি নাই ডুবে যেতে অতীতের সাগরে এখন।
ক্ষুদ্র এক দিন লিপি, বহু পৃষ্ঠা অলিখিত তার,
বিশৃঙ্খল ভাবরাশি ইতস্ততঃ রয়েছে পড়িয়া,
আমারে সাহায্য করে এত শক্তি কোথায় তাহার!
শিথিলিত ভাষা-বক্ষে কোন মতে আছে সে বাঁচিয়া।
কবিতার ছন্দে আমি চাহিয়াছি ফুটাইতে তারে,
কিন্তু এ হৃদয়ে নাই সঞ্জীবনী সুধা অমরার;
বাঁচিয়া বাঁচেনা স্মৃতি; শুধু এই প্রলাপ-সম্ভারে
রহিল আবদ্ধ হয়ে অস্থায়ী হৃদয় আমার।
নিরক্ষর নারী আমি, কোথা পাব ভাষা উপচার?
দেবতা! গ্রহণ কর ক্লান্তি-দগ্ধ ফল অশিক্ষার।

উৎসব।

হের আজি পত্রপুঞ্জ বসন্তের সুষমা-মণ্ডিত,
প্রকৃতি রঞ্জিত-মুখী বিকশিত কুসুম-শোভায়,
ধ্বনিছে বিহগ-কণ্ঠে অপরূপ সুমঙ্গল-গীত,
ভাসিছে মধুর চিত্র তটিনীর লহরী-মালায়।
মুকুলিত আশা মম পলে পলে পড়েছে ঝরিয়া,
ছিন্ন-বৃন্ত লয়ে তার রচিয়াছি জীবনী আমার,—
তুমি তা লয়েছ হাতে, তুমি তাহা দেখেছ পড়িয়া,
স্মরিয়া আমার ব্যথা ঢালিয়াছ নয়ন-আসার।
তাই আজি মধুময়ী প্রকৃতির সুষমা-সম্ভার,
দিকে দিকে হেরি তাই সৌন্দর্য্যের আরতি, বন্দনা,

হেরিতেছি ধরা-বক্ষে জাগিয়া আনন্দ অপার,
আকাশে বাতাসে ভাসে হৃদয়ের পুলক-মূর্চ্ছনা।
বেদনা বিপুলীভূত, কিন্তু তাহা নিরাকৃত আজ,
আপন গৌরবে তুমি জাগিয়াছ চিত্ত-অধিরাজ।

[১৩৩৩, ৭ই ফাল্গুন রচিত—অপ্রকাশিত]

আরতি।

তোমার সুন্দর মুখে সুমধুর হাসি ,
জীবন-উৎসবে মোর মুখরিত বাঁশী।
তোমার মধুর কণ্ঠ শ্রবণে আমার
নিয়ত ঢালিয়া দেয় সুধা অমরার।
স্বজনের ব্যবহারে যবে ব্যথা পাই,
তখন তোমার স্নেহে হৃদয় জুড়াই।
শত অভিঘাতে প্রভু আমি অবিচল,
সে শুধু পাইয়া তব প্রীতি অবিরল।
জীবন-আকাশে মম ধ্রুব তারা তুমি,
তোমার অভাবে ধরা শূন্য মরুভূমি।
সন্ধ্যার প্রদীপ তুমি, তুমিই প্রভাত,
স্বরগে মরতে তুমি জীবনের নাথ।
"প্রজাপতি—বরলব্ধ" তুমি চির প্রিয়,
জীবন-দেবতা তুমি হৃদয়-অমিয়।

১৩৩৩, ৪ঠা আষাঢ় রচিত—১৩৩৩, মা. "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আহুতি।

হে অর্চ্চিত! হে অনিন্দ্য! জীবনের আনন্দ আমার!
শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য ধরার!
এস তুমি, এস আজ ক্ষুদ্র এই হৃদি-সিংহাসনে,
আমারে ভুলিয়া আমি লুটাইব তোমার চরণে।
সংসারের মলিনতা, জীবনের শত চঞ্চলতা—
সব কিছু পাসরিয়া, জাগাইয়া পুণ্য-পবিত্রতা,
লভিব স্থিরতা।
তোমারি চরণতলে বাসনার ভিন্নতা ভুলিয়া,
র'ব আমি তোমাতে মিশিয়া।

শিখি নাই ধ্যান-পূজা, সত্ত্বগুণে নাহি অধিকার,
অভিমান সর্ব্বস্ব আমার।
রজঃ অধিকারী নই, লক্ষ্য নহে নিষ্কাম করম,
আসক্তির আরাধনা জীবনের উদ্দেশ্য চরম।
আপনার চারিপাশে বিরচিয়া স্বার্থের প্রাকার,
সুরক্ষিত করি শুধু আকাঙ্ক্ষার তুষ্টি আপনার,
—আমিত্ব-সত্তার।
জন্ম-জন্মান্তর ধরি, প্রবৃত্তির প্রলোভন পাশে
আপনারে বেঁধেছি উল্লাসে।

বাসনা-বিম্বিত প্রাণে ফিরি নাই জগতে জগতে
কামনার বিস্তৃত পথে।
অভাবের অনুভবে আঁখি দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়,
কেন্দ্র হারাইয়া হিয়া করিয়াছে পরিধি-আশ্রয়।

আশা নাই, তৃপ্তি নাই, কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়া
জীবনের সুখ-দুঃখ সযতনে রেখেছি ঢাকিয়া
তৃষ্ণা জাগাইয়া।
স্থূলতর অনুমিতি, ক্ষিতিতত্ত্বে গঠিত শরীর,
মনোবৃত্তি অবশ, অধীর।

তবু নাথ! আশা হয়, সব কিছু করিয়া অর্পণ
করি যদি তব নীরাজন,
চিন্তা করি,—তাতে যদি হয় দেব তব আরাধনা,
কথা বলি—যদি তাতে জেগে ওঠে তোমার বন্দনা,
তবে বুঝি দাঁড়াইয়া হৃদয়ের আসনে আমার
স্নেহ-স্মিত মুখে তুমি ল'বে মম পূজা-উপহার
বাসনা-সম্ভার।
তাই আজি প্রিয়তম, পাসরিয়া স্মৃতির স্বপন,
করিতেছি তব আবাহন।

[১৩৩৬, ৫ই বৈশাখ রচিত—অপ্রকাশিত]

শান্তি।

ধীরে ধীরে বেলা শেষ হয়,
ধীরে ধীরে আসে অন্ধকার,
বিহঙ্গেরা সঙ্গীত গাহিয়া
অঙ্কুরে ফিরে আপনার।
ফুরাইল আলোকের খেলা,
অবসিত বৈচিত্র্য-সম্ভার,

চারিদিক প্রশান্ত এখন,
—দাঁড়াইয়া শান্ত অন্ধকার।
ধরনীর প্রতপ্ত হৃদয়
হইল কি শীতল এবার ?
সুপ্তি-শান্ত সমাধি মগন
জীবনের অভিতাপ তার ?
বেলা-শেষে—কর্ম্ম-অবশেষে
আছে যদি বিশ্রাম এমন,
এস নিদ্রা! এস স্নেহময়ি,
তৃপ্ত কর আমারে এখন।

[১৩৩৫, ৩রা আষাঢ় রচিত—১৩৩৫, শ্রাবণ "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

প্রত্যাশী

এই যে ব্যাকুল হিয়া বহু শত আশা-বাসনায়,
—জীবনের অভিনব পথে,—
অপার্থিব-অভিমুখে ইহারা কি লইবে আমায়
ভাসাইয়া উন্মাদনা-স্রোতে ?

কিছুই কি বৃথা নয় ? সুখ, দুঃখ, বাসনার মায়া,
হাসি, অশ্রু, প্রীতি, অভিলাষ,
কল্পান্তস্থায়িনী এই কামনার চারু প্রতিচ্ছায়া—
সকলি কি আনন্দ-আভাস ?

সবাকার অন্তরালে শান্ত এক অন্তর্মুখী গতি
মহাব্যোমে স্পন্দিত করিয়া—
জাগাইয়া আকুলতা, জাগাইয়া করুণ মিনতি,
দূরপথে চলেছে ভাসিয়া ?

তাই যদি—তবে আর ব্যর্থতার আবর্ত্তে পড়িয়া
ঢালিব না শোক-অশ্রুজল,
চেয়ে র'ব পথপানে, প্রতীক্ষার আবেশে ডুবিয়া,
আপনারে করিব নির্ম্মল।

[১৩৩৫, ৮ই আষাঢ় রচিত—১৩৩৫, ভাদ্র "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত]

পরিস্ফুট

অস্তগত দিবাকর, রক্ত রশ্মি লেখা
লুকাইল নভঃ-নীলিমায় ;
শ্রান্ত দিবা ধীরে ধীরে দাঁড়াইল আসি
প্রতীচির সীমান্ত-রেখায়।

চেয়ে দেখে,—পড়িয়াছে বক্ষে ধরিত্রীর
কান্তিহীন প্রতিচ্ছায়া তার,
আলোকের উৎস-মুখে আত্ম-সমর্পিয়া
দাঁড়াইয়া পাষাণ আঁধার।

ঊর্দ্ধে চাহি দেখিল সে,—কোথা' কিছু নাই—
নীলাভাসে স্বপ্ন-ইন্দ্রজাল !
কেবল একটি তারা জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিয়া
স্নিগ্ধ হাসি হাসে চিরকাল।

যায় আশা, যায় তৃষ্ণা, তৃপ্তি চলে যায়,
অবসিত অশ্রু-অভিলাষ,
সারা বিশ্ব আবেষ্টিয়া হতাশ-হৃদয়
করে শুধু আপনা প্রকাশ।
কেহ তারে চাহে নাই,—মর্ম্ম-কথা তার
দিকে দিকে হয় প্রতিহত,
তবু সে আকুল প্রাণে ভগ্ন বীণা লয়ে
গান গাহে উন্মাদের মত।
সহসা ভাঙ্গিল ভুল—দেখিল চাহিয়া
মিথ্যা এই স্বপ্ন-সুখ তার,
ছিল সে,—আজিও আছে, র'বে চিরদিন,
সত্য শুধু ইহাই তাহার।

[১৩৩৪, ২৮শে চৈত্র রচিত—১৩৩৬, আশ্বিনে "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

প্রয়াস।

আমার অন্তরতম! অন্তরের কুঞ্জবনে
কর আজি সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
পুষ্পে-পর্ণে-কিশলয়ে ফুটে যেন প্রতিক্ষণে
অপরূপ সুষমা-আভাস।
কূজন, গুঞ্জন ধ্বনি
গাহে যেন আগমনী
প্রিয় তব কান্ত প্রতিমার,
স্মৃতি-তটিনীর তটে পড়ে যেন হিল্লোলিয়া
সৌন্দর্য্যের বন্দনা তোমার।

সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা তব করে যেন বিকশিত
সুন্দরতা শব্দ-র
আমার নিয়তি-লেখা হয় যেন নিয়ন্ত্রিত
স্পর্শ পেয়ে তব লাবণ্যের।
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম,
ক্ষণপ্রভা-প্রভাসম
কান্তি তব মধুর উজ্জ্বল,
সেই সৌন্দর্য্যের পায়ে লুটিয়া, করিতে চাই
আপনার কল্পনা নির্মল।

সংসারের আবিলতা করিয়াছে বিমলিন
ক্ষুদ্রতম হৃদয় আমার,
প্রতিপলে—অনুপলে পুণ্য-জ্যোতিঃ প্রভাহীন,
মসীলিপ্ত চিত্র কামনার।
জীবনের আকুলতা,
বেদনার গভীরতা
দিনে দিনে হয় অনুভূত,
শূন্যতার অন্ধকারে ধারণা ডুবিয়া যায়,
উৎসব-হরষ দূরগত।

তৃষ্ণা-আকুলিত বুকে তাই আজি স্নেহময়
আসিয়াছি সৌন্দর্য্য-আশায়,
আমার মানস-কুঞ্জ, পুষ্প, পর্ণ, কিশলয়,
দীপ্ত হোক্ তোমার আভায়।

মনোজ্ঞ শোভন তুমি,
তোমার চরণ চুমি
শোভাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী,
অন্তর-কালিমা মম নিরাকৃত কর প্রিয়
উছলিয়া সুষমা-লহরী।

৩১৫, জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৫, শ্রাবণ "মাতৃমন্দিরে"। প্রকাশিত।

পাথেয়।

জাগেনা আমার প্রাণে উন্মাদনা, উদ্দীপনা,
কণ্ঠ নহে সঙ্গীত-মুখর,
আশার অঞ্জন-রাগে নয়ন মণ্ডিত নয়,
বক্ষঃ নহে কুলিশ-কঠোর।
দীন আমি, অতি দীন—পড়ে আছি এক পাশে
অতীতের স্মৃতির সমান,
সরল সবল হিয়া যদ্যপি আমারে দেখে,
ক্ষণতরে হবে ম্রিয়মাণ।
অথবা করিয়া ঘৃণা বহু দূরে সরে যাবে
অমঙ্গল জানিয়া আমায়,
সংসারের এক প্রান্তে, জগতের এক কোণে
আছি আমি চির অসহায়।
ভাসিতে চাহিনি কভু বাসনার ঊর্ম্মি 'পরে,
অভিলাষ নাই কামনার,
একটি উজ্জ্বল আশা জাগে শুধু প্রাণে প্রাণে,
শুনিবে কি দেবতা আমার?

সে আশা তোমার কাছে হয়ত কিছুই নয়,
আমার সে অমূল্য রতন,
সম্ভাবনা করি' তার ভবিষ্যের চিত্রপটে
করি আমি আলেখ্য অঙ্কন।
একদিন—প্রিয়তম, জীবনের অবশেষে
আসিবে সে প্রার্থনীয় দিন,
ভুলিয়া আনন্দ দুঃখ সেদিন তোমার পানে
চেয়ে র'ব আসক্তি বিহীন।
কণ্ঠ হবে ধ্বনিহারা, মুখে না সরিবে বাণী,
বক্ষে না জাগিবে অনুরতি,
অন্ধকার আলোকের মিলনের শুভকালে
মঙ্গলের হবে পরিণতি।
নহে দৃষ্টি-বিনিময়, পৃথিবীর আকর্ষণ
কোন কিছু রবে না তথায়,
'তুমি আছ, আমি আছি' এই অনুভূতি শুধু
মিশে যাবে যুগল আত্মায়!

[১৩৩৫, ৪ঠা ভাদ্র রচিত—অপ্রকাশিত]

অতৃপ্তি।

বাসনার অগ্নিদাহে হৃদয় জ্বলিয়া যায়,
দীপ্ত হয় আমিত্ব আমার,
স্নেহ-প্রীতি-করুণার মধুরতা লুপ্ত হয়,
চারিদিকে জাগে হাহাকার ;
দীপ্যমান বহ্নি-শিখা
জাগাইয়া বিভীষিকা
দিকে দিকে প্রধাবিত হয়,
কেহ নাই—কিছু নাই ! কেবল আতপ রাশি
ত্রিভুবন করে ভস্মময় ।

কোথায় সুখের আশা,—জীবনের পবিত্রতা,
হৃদয়ের আনন্দ কোথায় !
যতদূরে দৃষ্টি যায়—জাগে শুধু আকুলতা,
তৃষ্ণা জাগে—অনল-জ্বালায় ।
মনোবীণা ঝঙ্কারিয়া
ভাষা ওঠে উচ্ছসিয়া,
এই কথা বলে বার বার,
নিবে যাক্ অগ্নি-শিখা, উষ্ণতা বিলুপ্ত হোক্,
শান্তি থাক্ হৃদয়ে আমার ।

হে প্রিয়, জীবন-সখা ! কি বলিতে পারি আমি,
কোন্ কথা আছে বলিবার ?
তোমারি চরণ তলে বিলুন্ঠিয়া দিবা যামি
জানাতেছি মিনতি আমার ।

পাপ-পুণ্য, হর্ষামর্ষ,
তোমারি আনন্দ স্পর্শ,
তুমি নাথ! আলো-অন্ধকার—
এই অনুভূতিটুকু জাগাইতে চাহি প্রাণে,
আশা কেন মিটে না আমার!

[১৩৩৫, ১০ই শ্রাবণ রচিত—১৩৩৬ শ্রাবণ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

নৈরাশ্য

কত কথা মনে জাগে, তা নহে বলিবার,
চিন্তার তরঙ্গমালা ভেসে আসে চলচ্চিত্র প্রায়;
আনন্দের প্রীতি-হাসি অশ্রুজল দুঃখ-বেদনার—
স্বপন-স্মৃতির সম জেগে ওঠে নিজ মহিমায়।
আছে সুখ, আছে দুঃখ—আছে নাথ, কল্পনা, ধারণা
আছ তুমি প্রিয়তম দিবানিশি আমারে ঘিরিয়া;
পিতা-মাতা-ভ্রাতৃরূপে করিতেছ কল্যাণ-কামনা,
পতিরূপে নিরন্তর মনে প্রাণে রয়েছ মিশিয়া।
পরিজন, প্রতিবাসী, পরিচিত শুভার্থীর বেশে,
শতরূপে স্নেহময় শতদিকে তব অধিষ্ঠান;
সন্তার পরাণরূপে জাগিতেছ আমার উরসে,
তথাপি জীবন-যজ্ঞে কেন মোর এত অকল্যাণ?
একি বিফলতা নাথ, এ কেমন দুর্ভাগ্য আমার—
করিতে তোমার পূজা তবু মম নাহি অধিকার?

[১৩৩৫, ৩রা বৈশাখ রচিত—অপ্রকাশিত]

সর্ব্বহারা।

বল প্রভু কত কাল আর
আমারে বহিতে হবে দাব-দগ্ধ জীবনের ভার?
হৃদয় আকুল হয়, অভিমানে চোখে আসে জল,
প্রতি পলে—অনুপলে চারিদিকে দেখি অমঙ্গল।

কতখানি বেদনা সহিয়া
আমার সময় কাটে নয়নের সলিল ঢালিয়া—
এতটুকু ছোট বুকে ভ'রে আছে কতখানি ক্লেশ—
কে তার সন্ধান রাখে? হায় প্রিয়, হায় পরমেশ!

একা—আমি চির একাকিনী,
একেলা কাটিয়া যায় অতি দীর্ঘ দিবস যামিনী।
জাগিয়া কি ঘুমাইয়া—চেতনা কি বিস্মৃতি লইয়া—
বুঝিতে পারি না আমি বেঁচে আছি কাহারে স্মরিয়া।

লুপ্তপ্রায় চিহ্ন অতীতের,—
আঁধার গহন তলে অবলুপ্ত রশ্মি ভবিষ্যের।
বর্ত্তমান এ জীবন মনে হয় প্রহেলি-সম্ভার,
আশার আলোক নাই, চারিদিকে দেখি অন্ধকার।

তমসার পাথারে পড়িয়া,
জীবন যাপিব আমি কোন্ স্বপ্ন রচনা করিয়া?
'আপন' বলিয়া কিছু স্মৃতি-পটে নহে প্রতিভাত।
কেমনে কাটিবে কাল—বল প্রিয় জীবনের নাথ!

কোথা শক্তি, বল শক্তিময়!
কোথা বিরাজিত নাথ শান্তিময় তোমার আশ্রয়!
পথহারা—স্নেহহারা—হের প্রভু, আমি লক্ষ্যহারা,—
আঁধার জীবনে মম ঢেলে দাও আলোকের ধারা।

কর দেব, স্নেহ-আশীর্ব্বাদ,
ক্ষণিকের তরে আজি বিদূরিত কর অবসাদ।
সে শুভ-নিমেষে আমি সব কিছু বেদনা ভুলিয়
তোমার চরণ তলে প্রীতি ভরে পড়িব লুটিয়া।

[১৩৩৫, ২১শে আষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত

হতাশে।

বীণায় বাঁধিয়াছিনু বেহাগের সুর
সযতনে নিভৃতে বসিয়া,
সাধের বীণার তার ছিঁড়িল সহসা,
দেখিলাম বারেক চাহিয়া!

ঊষার শিশির মাখা ফুলগুলি লয়ে
বড় সাধে গেঁথেছিনু হার,
গলায় হলনা পরা—রবির কিরণে
শুকাইল মালিকা আমার!

পূজার আরতি তরে দীপ হাতে লয়ে
দাঁড়াইয়া ছিলাম অঙ্গনে,
বাতাসে নিবিয়া গেল আলোক আমার,
অশ্রুজল ঝরিল নয়নে!

দেখিতেছিলাম আমি নিশার স্বপনে
ধরা সাথে স্বরগ-মিলন!
সহসা আসিয়া ঊষা বসুধার বুকে
ভেঙ্গে দিল সাধের স্বপন।

হিরণ-কিরণ মাখা মণিময় হার
পরেছিনু আদরে গলায়,
বিষাক্ত সাপিনী হ'য়ে সে হার গলার
একদিন দংশিল আমায়।

যাহা ধরি তাই যেন ছাই হয়ে যায়,
আমি বুঝি নহি এ ধরার!
তাই যদি সত্য হয়, তবে কেন হায়!
প্রাণে এত জাগে হাহাকার?

[১৩২৬, ৪ঠা পৌষ রচিত—১৩২৮ "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত

নিশীথে।

গভীর রজনী, ধরণী নীরব, শীতল সমীর বয়,
কাননের কোলে হাসিছে ফুটিয়া নিশীথ-কুসুমচয়।
নিবিড় আঁধার ভাসিছে আসিয়া নিচল নয়ন তলে,
দিশাহারা হ'য়ে পড়ে আছে যেন যামিনী ধরার কোলে।
সুদূর প্রান্তরে নিশাচর পশু থেকে থেকে তোলে তান,
প্রতিধ্বনি তার সমীরে ভাসিয়া কাঁপায়ে তুলিছে প্রাণ।
দূরে গিরিমালা—তাহার পিছনে নিবিড় জলদরাশি
ধরার হৃদয়ে তমসা ঢালিয়া নীরবে উঠিল ভাসি।
অদৃশ্য তারকা, আকাশের বুকে ক্ষীণ আলোকের রেখা
কখনো ভাসিছে, কখনো ডুবিছে, যেন সে জগতে একা!
জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আমি চাহিলাম চারিদিকে,
একি অন্ধকার ঘিরেছে আসিয়া মোহিনী ধরার বুকে!

ঝটিকার আগে প্রকৃতি যেমন স্থির বারিধি সম,
আজি ধরণীরে বুঝি বা হেরিনু সেইরূপ অনুপম।
সহসা আমার শরীর কাঁপিল, শিহরি উঠিল প্রাণ,
দূরে—অন্ধকারে কে যেন ধরেছে বাঁশীতে পূরবী তান।
নাহি চন্দ্র-তারা, নাহি চরাচর, যেন বা জগৎ নাই,
শুধু অবিরাম বাঁশরীর সুর শ্রবণে শুনিতে পাই।
অনন্ত আকাশে কাঁদিয়া ফিরিছে সুরের মূর্চ্ছনাটুক্,
চিরদিন যেন এ করুণ সুরে ভরেছে আমারি বুক।
ধরণীর প্রান্তে—বিরলে বিজনে, একটি ঘরের কোণে
যে জীবন মোর গিয়াছে কাটিয়া অতিশয় সঙ্গোপনে।
আজি হেরি তার ম্লান প্রতিচ্ছায়া বাতাসে ভাসিয়া যায়,
আমার বুকের ছোট কথাগুলি আকাশে মিশিতে চায়।
অসীম আকাশ—বিশাল প্রান্তর—বিস্তৃতা বসুধা মাতা,
বিশালতা মাঝে কেমনে মিশিবে ক্ষুদ্র এ জীবন-গাথা।
কোথায় পড়িয়া রয়েছে আমার সুখ-দুঃখ-অনুভূতি,
দেবতা কোথায়—কার পায়ে আমি নিশি দিন করি নতি ?
কে দিবে মুছায়ে যতনে আমার নয়নের অশ্রুজল,
কাহার পরশে বিকশি উঠিবে হৃদয়ের শতদল !
সম্মুখে বাড়িয়া চলেছে আঁধার, হায়, আমি পথহারা,
গগনের কোলে আলোক কোথায়, কোথা দীপ্ত ধ্রুবতারা।
কোথা আছ তুমি জগতের নাথ—আমা হতে কত দূরে ?
কোন্ পুণ্যফলে হৃদয় আমার ভরিবে তোমার সুরে।

[১৩৩০, অগ্রহায়ণে রচিত—১৩৩৩,ভাদ্রে "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

রিক্ত

আজ আর কিছু নাই, নিঃস্বম্বল আমি।
আজ শুধু চেয়ে র'ব অতীতের পানে ;
ছড়ায়ে মলিন আলো রবি অস্তগামী
ক্ষীণ জ্যোতিঃ ঢেলে দেয় বিদীর্ণ পরাণে।
ম্লানমুখে পরে ধরা শোণিতের সাজ,
আমি শুধু সেই দিকে চেয়ে র'ব আজ।

অযুত আলোক ভাতি উঠে বিভাসিয়া ;
স্মৃতির বিশাল গ্রন্থে—প্রত্যেক পৃষ্ঠায়,
আশার কনক-লেখা উঠে উছলিয়া,
তারি মাঝে নিরাশার কালি দেখা যায়।
বিরলে খুলিয়া সেই স্মৃতি-গ্রন্থখানি
অনিমিষ-চোখে শুধু চেয়ে র'ব আমি।

অতীত কি বর্ত্তমানে ভুলাইতে পারে ?
আছে কি বিস্মৃতি এত অতীতের কোলে ?
ভুল ভেঙ্গে গেল আজ—পড়িনু পাথারে,
স্মৃতির লেখায় শুধু অগ্নিরাশি জ্বলে।
বাস্তব-জগতে এ যে স্বপন-সান্ত্বনা !
হায়, আমি করি তবে কার উপাসনা ?

[১০২৮, ১৫ই কার্ত্তিক রচিত—১৩২৯, চৈত্র "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

নিরাশায়

আশা নাই, তৃপ্তি নাই, নাই কোলাহল,
নীরবে কাটিয়া যায় জীবন আমার ;
ধূলায় মিশিয়া যায় তপ্ত অশ্রুজল,
সমীরে পূরিত হয় ব্যর্থ হাহাকার।

কিসের এ ব্যথা আমি না পারি বলিতে,
আমার ধারণা শক্তি গেছে হারাইয়া ;
কোথায় যাতনা আমি না পারি বুঝিতে,
দিবস রজনী শুধু শূন্যময় হিয়া।

এ জীবন লয়ে আর কত দিন
সময় কাটাতে হবে ধরণীর বুকে ?
দুঃসহ দুঃখের ভারে হইয়া মলিন
শূন্যে চেয়ে আর কত র'ব ম্লানমুখে ?

বেদনা প্রবল যদি হয় ধরাতলে,
ঝাঁপ দিয়া পড়িব কি পরিখার জলে ?

[১৩২৯, ২৮শে শ্রাবণ রচিত—১৩৩৬ মাঘ "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

ব্যথা।

বসন্তের মধুর প্রভাতে
ছড়াইয়া ত্রিদিব-সুষমা,
এসেছিল "অশোকা" আমার,
সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল প্রতিমা

মধুমাখা হাসিটুকু তার,
নয়নের দৃষ্টি সুমধুর,
কণ্ঠস্বরে ফুটিত তাহার
বিহঙ্গের কাকলীর সুর।
শ্রাবণের অবসান কালে
ঝরে গেল বসন্তের ফুল,
রজনীর তিমির-উৎসঙ্গে
লুকাইল সৌন্দর্য্য অতুল !—
কিছু আমি চাহি না বলিতে,
ঢালিব না নয়নের জল,
পরলোক যাত্রা-পথে তার
করিব না কিছু অমঙ্গল।
শুধু এক দুঃখের আঘাতে
অন্তরাত্মা করে হায় হায়,
একবার—বারেকের তরে
"মা" ব'লে সে ডাকেনি আমায় !

[১৩৩০, ১৭ই ভাদ্র রচিত—অপ্রকাশিত]

আক্ষেপ।

পড়ে থেকে বিছানায়— দিনগুলি চলি যায়,
চেয়ে দেখি শান্ত আঁখি তুলি,
কিছুই হলনা করা, আমার বাঁচিয়া মরা
বৃথা এই ক্ষীণ আশাগুলি।

জীবনের যত কাজ কামনার কক্ষে আজ
ছড়াইয়া রহিল পড়িয়া,
স্মৃতির নিভৃত কোণে বাসনা মলিন মনে
লুটিতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তুলিয়া করুণ আঁখি আমি শুধু চেয়ে থাকি,
আর কিছু নাহি বলিবার,
প্রবল ঝটিকা রাশি উথলিয়া দেয় আসি
ব্যথা ভরা হৃদয় আমার।
হাসি-আবরণ দিয়ে অশ্রু রাখি লুকাইয়ে,
আর কিছু করিবার নাই ;
জীবন-বীণার তার সুর তোলে বার বার
চল চল, যাই—যাই—যাই।
যাই—যাই, যাই চলে, সুন্দরী ধরার কোলে
পড়ি গিয়ে জনমের মত।
অস্ফুট জীবন-ছবি,— আজি পড়ে থাক্ সবি
অপূর্ণ কামনা আছে যত।

[১৩৩০, ৮ই মাঘ রচিত—অপ্রকাশিত]

সমর্পণ

হৃদয়ের সাধ, আশা, লালসা, কামনা,
নয়নের অশ্রুজল, আননের হাসি,
জগতের শতসুখ, সহস্র বাসনা,
পুণ্য-পূত ভালবাসা—স্নেহ অবিনাশী—
সকলি তোমার পায়ে দিয়েছি ঢালিয়া,
আমার বলিতে কিছু রাখিনি ত বাকি !

তোমারে হেরিলে যাই নিখিল ভুলিয়া,
পবিত্র আমার হিয়া তব স্মৃতি মাখি।
দিনান্তে বিজনে আজ বসিয়া একেলা
ভাবিতেছি জীবনের কত শত কথা;
অসম্পূর্ণ আছে কিগো আনন্দের মেলা—
ফুটিতে কি পারে নাই হৃদয়ের ব্যথা?
কিছু যদি বাকী থাকে বল তবে আজ,
সকলি সঁপিয়া দিব ওগো রাজ-রাজ।

১৩৩১, ৫ই জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩৩৫, আষাঢ় "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত।

বরণ।

না ফুরায় আঁখি-নীর যদি এ জনমে কভু,
মানিয়া লইব আমি সে-ও তব দান বিভু।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
ব্যথা যদি বাস করে,
সুখ শান্তি অবসান মনে না ভাবিব তবু।

নিভৃতে একেলা বসি গাহিব আশার গীতি,
প্রতি কামনার বুকে ফুটিবে প্রাণের প্রীতি।
সবারে মধুর স্বরে
ডাকিব আদর ক'রে,
আমার মমতা, স্নেহ উছলিত হবে নিতি।

তোমরা করিবে নিন্দা—স্নেহ প্রীতি ভুলে যাবে,
আমারে আঘাত দিয়া হৃদয়ে আনন্দ পাবে।
তাই যদি কাম্য হয়,
কর—যাহা মনে লয়,
আমার নিকটে এসে বেদনা সার্থক হবে।

[১৩৩১, ১২ই শ্রাবণ রচিত—১৩৩৫, আশ্বিন "মাতৃমন্দিরে" প্রকাশিত]

আমার কবিতা।

লেখনী লইলে করে কেঁপে ওঠে হাত,
ভাষার অভাবে ভাব হারাইয়া যায়—
তার-ই সাথে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত
আমার কবিতা-রাজ্যে বিপ্লব বাধায়।
অসুস্থ শরীর আর ব্যথিত অন্তর
দিবা নিশি বাধা দেয় রচনা করিতে;
পরিবাদী পরিহাস করে নিরন্তর,
শিক্ষাদাতা নাহি কেহ ভ্রান্তি নিরসিতে।
এমন বিপত্তি মাঝে লেখনী ধরিয়া
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি করিব রচনা,
ভুল থাক্—মন্দ হোক্—গ্রাহ্য না করিয়া
ফুটাব লেখনী মুখে একাগ্র সাধনা।
পরিশেষে একদিন অনল জ্বালিয়া
সাধের কবিতাগুলি দিব পোড়াইয়া।

[১৩৩১, ১৫ই শ্রাবণ রচিত—অপ্রকাশিত]

উপহার।

মনে নাই, কত দিন—কত বর্ষ আগে
কবে গেঁথেছিনু হার বিরলে বসিয়া ;
আশার কুসুমগুলি অরুণের রাগে
ফুটেছিল কোন্ যুগে সুষমা ঢালিয়া !

তাঁর পরে কেটে গেছে কত কত দিন—
স্মরণের ইতিহাসে রাখিনি লিখিয়া,
অজানা বিষাদে কবে হৃদয়ের বীণ
জানিনা, ঢেলেছে অশ্রু ব্যথায় গলিয়া।

বসন্ত প্রভাতে আজি দেখিনু সহসা
অযত্ন-মলিন সেই শুষ্ক ফুল-হার,
হাসি-প্রীতি-অশ্রু আর কামনা-লালসা
সকলি শিথিল—ছিল যত উপচার।

ঝরে গেছে দলগুলি, বৃন্তমাত্র সার,
লও প্রিয়তম আজি দীন উপহার।

[১৩২৮, ২রা ফাল্গুন রচিত —১৩২৮, চৈত্র "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত]

আ

ফোটেনা প্রাণের ভাষা মুখের কথায়,
জানি দেব, সে তোমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ ;
জড়িত জীবন-তরু বিষাদ-লতায়,
জানি আমি এ তোমার মঙ্গল-প্রসাদ।

হাসির আড়ালে ঢাকা নয়নের জল,
বসন্ত-বাহারে বাজে-পূরবীর সুর,
আঁকিতে সুখের ছবি লেখনী বিকল—
আমি জানি এ তোমার আশীষ মধুর।

সাঁজের আঁধার কোলে দিনমান প্রায়
অতীতের চারু ছবি ধীরে অবসান ;
আবেশ-জড়িমা জাগে আঁখির পাতায়,
আশার অতৃপ্ত সাধে ব্যাকুল পরাণ।

কি বলিতে পারি আমি জগতের নাথ,
মানিব আশীষ বলি দারুণ আঘাত।

[১৩২৭, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রচিত —১৩২৮, মাঘে "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত]

প্রতীক্ষায়

যেদিন ভুলিয়া যাব
জগতের হাসি রাশি,
চলে যাবে সব স্মৃতি
বিস্মৃতি-সাগরে ভাসি।
প্রকৃতির শোভা হেরি
মোহিত হবে না প্রাণ,
সাধ-আশা-বাসনার
হয়ে যাবে অবসান।

ভুলে যাব একেবারে
ধরণীর কোলাহল,
অপূর্ণ কামনা তরে
চোখে না আসিবে জল।
সুখ-দুঃখ-শোক-মোহে
ব্যথিত হবে না হিয়া,
"করম" "বিশ্রাম" "শান্তি"
সব যাব পাসরিয়া।
যে দিন স্মৃতির মোহে
হব না আপনা হারা,
ডুবিবে নয়ন তলে
অরুণ-চাঁদিমা-তারা।
উজলি উঠিবে হিয়া
অবনী-নাথের ভায়,
চেয়ে আছি শূন্য পানে
সে দিনের প্রতীক্ষায়।

[১৩২৭, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রচিত—১৩২৮, প্রাবৃট্ সংখ্যা "প্রভাতীতে" প্রকাশিত]

অনুভব।

মরমের মাঝে কাহার আহ্বান শুনি গো প্রাণের সখা,
দিবসে নিশীথে প্রতি পলে পলে কে দেয় আমারে দেখা!
সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যের মাঝে শুনি কার প্রিয় বাণী,
বিষাদিত হলে কে আসি যতনে মুছায় আনন খানি।
ধরণীর শত শোভার মাঝারে ভাসিছে প্রতিমা কা'র,
কার স্নেহ নদী সতত উছলে, কে সে প্রেম-পারাবার!

কে আমারে সদা করিছে আদর, নিয়ত বাসিছে ভাল,
তমসার মাঝে মরমের তলে কে দেয় জ্বালিয়া আলো !
আমার নয়নে আমার পরাণে জাগিছে মূরতি কা'র !—
সে যে তুমি সখা, সে যে তুমি নাথ, সে তুমি জীবন-সার।

[১৩২৭, ১২ই কার্ত্তিক রচিত—১৩২৮, মাঘে "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত]

সার্থকতা।

কেটে গেল দিন গুলি অতৃপ্ত আশায়,
রাজসভা তলে আসি দাঁড়াইল সীতা,
আশা ছিল স্থান পাবে দয়িতের পায়,
কোলে নিল বসুমতী আপন দুহিতা।

আঁধার শ্রাবণে ধরা আঁধার মূরতি,
দাঁড়ায়ে অভাগী রাধা যমুনা-বেলায় ;
কতদূরে প্রিয়তম মথুরার পতি—
জীবন কাটিবে তার কিসের আশায় !

পতির প্রীতির তরে নয়ন বাঁধিল
শত কুমারের মাতা সুবল নন্দিনী,
সারাটি জীবন তার কাঁদিয়া কাটিল,
পতি-পুত্রবতী-সতী চির অভাগিনী।

এই অতৃপ্তির ব্যথা—এই অশ্রুনীর—
পরিপূর্ণ সার্থকতা জীবনে নারীর !

[১৩২৭, ১৮ইআষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত]

উৎসর্গ

দিনে দিনে হয়ে আসে শরীরের ক্ষয়,
সহিতে পারি না আর পীড়ার যাতনা,
অধীর বেদনা ভরা আকুল হৃদয়
এইবার করিতেছে মুক্তির কামনা।

আকাঙ্ক্ষা, বাসনা আর অভিলাষ রাশি
অপূর্ণ রহিয়া গেল জনমের তরে ;
দয়িতের প্রিয় ছবি, দুহিতার হাসি,
দেখিবার সাধটুকু ডুবিল অন্তরে।

ছিঁড়িল হৃদয়-তন্ত্রী—থেমে গেল গান,
নিভিল স্মৃতির আলো কালের ফুৎকারে ;
আশার অতৃপ্ত সাধে ব্যাকুল পরাণ—
কল্পনা আকুল চোখে চাহে চারিধারে।

বেদনার রক্ত-রাগে রঞ্জিত হৃদয়,
তোমারে দিলাম সঁপি ওগো বিশ্বময়।

[১৩৩২, ৩রা আষাঢ় রচিত—অপ্রকাশিত]

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

(* চিহ্নিত ছত্রগুলি কবির স্বহস্ত-লিখিত)

পৃষ্ঠা ৩, "পীলাত", পাইলেট্।

"ঈশা," যীশু খ্রীষ্ট।

পৃষ্ঠা ৬, "মহামিলন", কবির স্বামীর উদ্দেশে রচিত; "উচ্ছ্বাস" শীর্ষক কবিতা (পৃঃ ৬৪) দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ১০, "শেফালিকা", কবির কনিষ্ঠা কন্যা।

* তনম্ তুদ্, "গরম দুধ"।

পৃষ্ঠা ৬৮, "অতীতের স্মৃতি", কলিকাতায় হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা প্রসঙ্গে রচিত।

পৃষ্ঠা ১০২, * "বারানসী", বরণা ও নাশী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র বলিয়া এই নাম (জাবালোপনিষদ); মতান্তরে সর্ব্ব পাপ বারণ করে বলিয়া 'বরণা' এবং সর্ব্ব পাপ নাশ করে বলিয়া 'নাশী'। নাশী পরে 'অসি' হইয়াছে।" (জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান)।

পৃষ্ঠা ১০৭, "উদ্বোধন", কবির 'জীবনী' দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ১১০ * "অঞ্জলি",—"মেজ জ্যেঠা মহাশয় স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত। ইনি "শঙ্করাচার্য্যচরিত" "রামানুজচরিত" "দাক্ষিণাপথ ভ্রমণ" প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ এবং "চারু সন্দর্ভ" "নীতি-সন্দর্ভ" "রচনা-সোপান" "সংস্কৃত পরিচয়" প্রভৃতি স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। "উত্তরাপথ ভ্রমণ" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ লিখিতে ইঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ রচনা করিবার পরে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে ১৩২২ সালে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে দেহ ত্যাগ করেন বলিয়া তাহা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।"

পৃষ্ঠা ১১১, * "অঞ্জলি",—"সেজ জ্যেঠা মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয়ের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। ইনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ণের ভার গ্রহণ করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে. সিংহল বা ব্রহ্মদেশ হইতে আর কেহ কখন এই পরীক্ষা দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইনি তিব্বতীয় অতিকায় গ্রন্থ "তেঙ্গুর" ও "কেঙ্গুরে"র অনুবাদ করিতে ছিলেন, কিন্তু নিয়তির আহ্বানে তাঁহাকে অকালে চলিয়া যাইতে হইল বলিয়া রচনা সমাপ্ত হইল না।"

পৃষ্ঠা ১১৪, * "অ্যাড্‌ভোকেট্‌ মিঃ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌", "ইনি "অর্চ্চনা" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, এবং "কনক রেখা" বিবাহ-বিপ্লব" "চিত্রাবলী" "কটাক্ষ" "হিসাব নিকাশ" "আসমানের ফুল" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।"

পৃষ্ঠা ১১৪, "সুহৃদ্বরেষু",—"এবার কবি" ও "রবীন্দ্রনাথ"-প্রণেতা শ্রীযুত প্রিয়লাল দাস এম্‌-এ. বি-এল্‌ মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত।

পৃষ্ঠা ১১৬, "**ব্যথিতার গান**",—কোনও কবির ব্যথা-ভরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসটুকু যে পদ্যময় রচনা ধরিয়া রাখে তাহা ঠিক কবিতা নয়—আরও বেশী কিছু। এই শ্রেণীর কবিত্বময় রচনার অন্তর্নিহিত ভাব করুণরস-মিশ্রিত সঙ্গীতের ন্যায় আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। চারুলতা দেবীর রচনায় এই প্রকার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার কবিতা-পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। কবির আসল জীবন-পালা হইতেই কিন্তু তাঁহার রচিত খণ্ড কবিতাগুলির উৎপত্তি। সেইজন্য কবির জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস-ও "ব্যথিতার গান" ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। চারুলতা দেবী বাস্তবিক "শোভাময়ীর জীবন-কাব্যের" পটে তাঁহার নিজের বিষাদময় জীবনের কাহিনী অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই সুবৃহৎ চিত্রের যতটুকু দেখিবার আমাদেব অধিকার আছে ততটুকুই এস্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য "জীবন-কাব্যের" নায়িকা শোভাময়ী,—কবি স্বয়ং; বিমল, তাঁহার স্বামী; আভাময়ী,—কবির কনিষ্ঠা ভগিনী। উক্ত কাব্যে যে রাজপথের উল্লেখ আছে তাহা কবির বাটীর সম্মুখস্থ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, গড়পার।

পৃষ্ঠা ১১৭, * "পরিখার পরপারে",—"আপনি যদি দিনের বেলা আসেন, আমি আপনাকে খাল দেখাইব। কিন্তু আমার গল্পের সঙ্গে বর্ত্তমান গড়পারের

কিছুমাত্র মিল দেখিবেন না। "পরিখার পরপারে" এখন আর "শ্যামল প্রান্তর" নাই, সেখানে প্রকাণ্ড এক দেশলাইয়ের কারখানা দেখিবেন, আর এই কারখানার কল্যাণেই ও-ধারের "নিবিড় বনের রেখা" টুকু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এখন শীতকাল, খালের জল কমিয়া গিয়াছে, ঘরে বসিয়া জল দেখা যায় না, ছাদে উঠিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া সব দেখা যায়। খালের এ-ধারেও মাঠ ছিল, কত রকমের গাছ ছিল, এখন সে সবের বদলে কাঠগোলা, নারিকেল মালার গোলা, এই সব দেখা যায়।" (চারুলতা দেবীর পত্র, তারিখ ৩০শে মাঘ ১৩৩৫)—গড়পারের সন্নিকট বেলেঘাটার খালের উদ্দেশে "পরিখা" শব্দটি চারুলতা দেবীর রচিত কবিতাবলীতে বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে। "নিরাশায়" শীর্ষক কবিতা (পৃঃ ১৬৪) দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ১২৫, "পীড়িতা"—* "নিজে কেমন আছি ইচ্ছে ক'রেই সে কথা লিখ্‌তে ভুলে গিয়েছি; কিন্তু কি লিখ্‌ব বলুন? ১৪।১৫ দিন থেকে জ্বর হয়েছে, এক মিনিটের জন্যও জ্বর ছাড়ে না, ৯৯° অথবা ১০০°—মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে স্মরণ-শক্তির গোলমাল হ'য়ে যায়; কি যে বলি. কি যে লিখি, নিজেই বুঝি না—দিনের মধ্যে ৩।৪ বার হার্ট প্যাল্‌পিটেশন্‌ আরম্ভ হয়, ২০।২৫ মিনিট পরে ধড়ফড়ানি থেমে গিয়ে একটা অবসাদের ভাব এসে পড়ে—এই সব কথা লিখ্‌ব ত? ও আমার লিখ্‌তে ইচ্ছে হয় না, ততক্ষণ অন্য কথা বল্‌লে কাজ হবে। দধীচির অস্থির চেয়েও আমার অস্থি কঠিন; আগুনে দিলে পোড়ে না, জলে দিলে গলে না, আছাড় মারলে ভাঙ্গে না!" (চারুলতা দেবীর পত্র, তারিখ ২৬শে মাঘ ১৩৩৫)।

বহু বৎসর যাবত কঠিন পীড়া ভোগ করিয়াও চারুলাদেবীর কবি-হৃদয়ের নিভৃত-কুঞ্জে বিমল "হিউমারের" উৎস যে শুকাইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ কবির একাধিক পত্রে পাওয়া যায়।

* "আমার ত বিশেষ কিছু অসুখ হয় নাই।* * আমার শরীর খাওয়া আর ঘুম এই দু'টি জিনিষের সঙ্গে নন্‌-কো-অপারেশন্‌ করিয়া দিয়া কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম লইতে চায়, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। গত দুই তিন বৎসর ধরিয়া সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিতাম না, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িতাম। জাগিয়া উঠিয়া টেনিসনের "মে-কুইনে"'র মত বলিতে

ইচ্ছা হইত—"সারাটি রজনী আমি জাগিয়া পড়িয়া থাকি, ঢুলে পড়ি হইলে সকাল।" এখন ঠিক তাহার উল্টা; রাত্রি দশটা এগারটার সময় ঘুমাইয়া পড়ি, সমস্ত রাত্রির ভিতর একবারও জাগি না—কিন্তু সকাল বেলা উঠিতে পারি না। উঠিয়া বসিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়, পূর্ব্ব দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়াও চোখে অন্ধকার দেখি, অগত্যা "জাগিয়া পড়িয়া থাকি।"* * সাত আট দিন পূর্ব্বে মেয়ের একটা ফ্রক্ সেলাই করিতে করিতে দিনের বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিবার সময় দেখিলাম, অবস্থাটা সকাল বেলাকার মত-ই। তখন মনে হইল ঘুম একটা পরিশ্রম, আর আমার শরীর এই পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। গতবৎসর হইতে যথা-ইচ্ছা পান-ভোজন ছাড়িয়া দিয়াছি। * * খাওয়ার পরে পেটে এত যন্ত্রণা হয় যে, ঘণ্টা-দুই চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার পর উঠিয়া বসিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল, কবিজনোচিত শরীরে আহার নিদ্রা সহ্য হয় না। ও-সব বাদ দিয়া বিছানায় পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" (চারুলতা দেবীর পত্র, তারিখ ২০ শে আশ্বিন ১৩৩৫)

রস-সাহিত্যের দিক হইতে পরীক্ষা করিলে চারুলতা দেবীর গদ্য-রচনা যে চমৎকার তাহার প্রমাণ পাই আমরা তাঁহার লেখনী-প্রসূত ছোট গল্পে। গদ্য ও পদ্য-মিশ্রিত একখানি পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এই পত্রে কবির চা-পায়ী সখিদের কথা লিখিত আছে।

* "পত্র লিখিতে বসিলাম। বর্ণনীয় বিষয়টি জানাইবার আগে একটুখানি বন্দনা সারিয়া লই,—

"আজি গো চা-রাণী, চরণে তোমার এনেছি অর্ঘ্য করিতে দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিলসিক্ত শতেক চা-খোর দীনের প্রাণ।"

অথবা—

"যে দিন সুনীল আসাম হইতে উঠিলে সঘনে চায়ের শীর্ষ—
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি গো ভক্তি, সে কি গো হর্ষ।"

—এই বার চিঠি আরম্ভ করা যাক্।

"সাবধানে কটিপুচ্ছ বাঁধরে লেখনী,
আজিকার রণে বাছা পরমাদ গণি।"

সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন—"সোনার কিরণ মেখে সাজিয়াছে উষারাণী, হেম-করে খুলিতেছে পূর্ব্বাশার দ্বার খানি—আমি বিছানা ছাড়িয়াছি এমন সময়ে একজন মহিলা আসিয়া দেখা দিলেন"—(রাঁচি হইতে লিখিত চারুলতা দেবীর পত্র, তারিখ ৩০ কার্ত্তিক ১৩৩৫)

ভ্রম-সংশোধন।

পৃঃ (ক)—"জাগণের", "জাগরণের" হইবে।

পৃঃ (ঠ)—"ইংরেজ", "ইংরেজী" হইবে।

পৃঃ ৪০—"সিগ্ধ", "স্নিগ্ধ" হইবে।

পৃঃ ৭৯—"গাখী", "পাখী" হইবে।